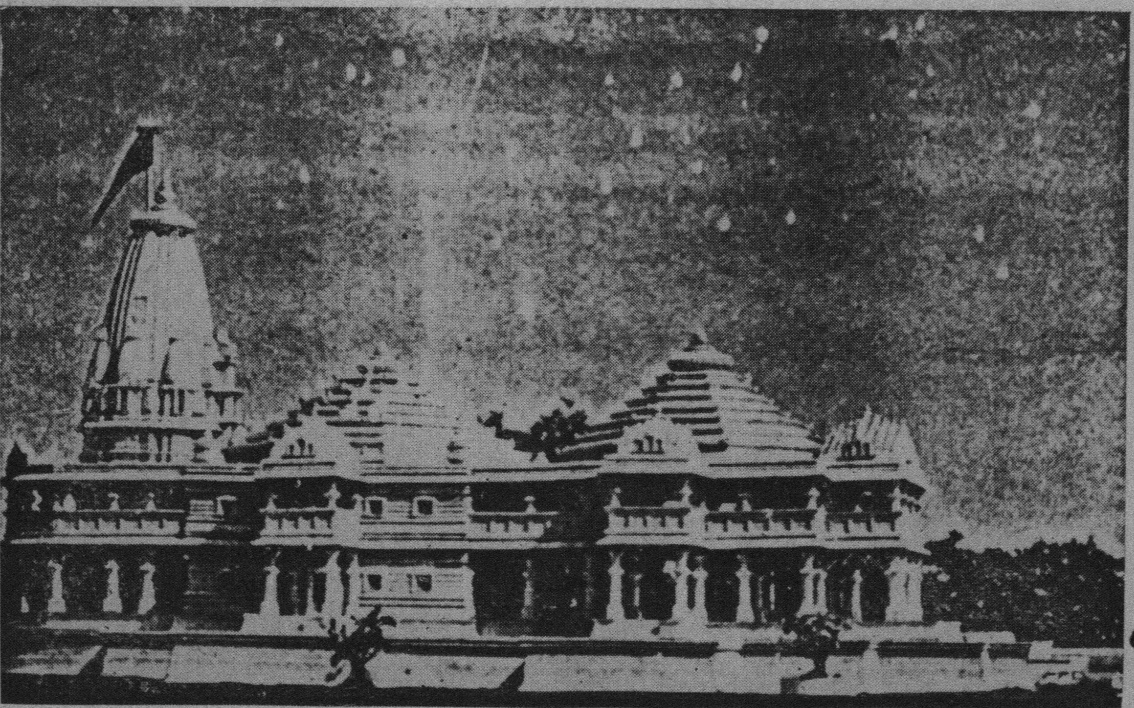
প্রথম প্রকাশ :
প্রজাতন্ত্রদিবস ১৯৯১, ১২ মাঘ ১৩৯৭

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম
চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩। মুদ্রক : সুশীল প্রিণ্টার্স,
২ ঈশ্বর-মিল বাই লেন, কলিকাতা-৬।



বিতর্কিত সৌধের বহুদূরে স্থাপিত শিলান্যাস-স্থলে প্রস্তাবিত মন্দিরের ব্লু-প্রিন্ট

এ-মহাভারতের
সর্ব-সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধির
উদ্দেশে

পূর্বভাষ

ধর্মকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ যুদ্ধের কথা ইতিহাস-পাঠে কিছু-কিছু জানার সুযোগ ঘটেছে—কিন্তু চর্মচক্ষে কখনো তা দেখি নি। রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের সেই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

আর পাঁচজন বাঙালি যুবকের মতোই এ-বিষয়ে আমার অবজ্ঞা প্রথম থেকেই। নিছক একটা রাজনৈতিক ব্যাপার ছাড়া এটিকে তার বেশি কোনো মূল্য আমি দিই নি। কিন্তু আমার ভুল ভাঙিয়ে দিলেন পরম পূজনীয় পণ্ডিতকেশরী শ্রী প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। কথায়-কথায় একদিন এ-বিষয়ে আমার উন্নাসিকতার প্রকাশ দেখে তিনি স্নেহভরে আমায় ভুল সংশোধন করে দিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক রামমন্দিরের অতীত ইতিহাস তিনি অনর্গল বলে গেলেন। শুনে অনুতপ্ত হলাম নিজের অজ্ঞতার জন্য!

এ-বিষয়ে গ্রন্থ-রচনার চিন্তা মনে এলেও এমন একটি বিতর্কিত বই ছাপানোর প্রকাশক কোথায়? ভারবির কর্ণধার শ্রী গোপীমোহন সিংহ রায় মহাশয় ঠিক এই সময়েই একদিন ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে এলেন। সেদিনও এ-প্রসঙ্গ উঠতে তিনি নিজে থেকেই এ-বিষয়ে একখানি পুস্তক-রচনার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। তাঁর সময় না-থাকায় তিনি শ্রী সিংহরায় মহাশয়কেই এ-কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। কিন্তু তাঁরই বা সময় কোথায়? তখন ডাক পড়ল আমার। এ-কাজের যোগ্য আমি নই—তবু দায়িত্ব নিলাম সত্য-উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে।

কিন্তু এমন একটি বিতর্কিত বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে প্রতিটি বক্তব্য বিষয়েরই যথোপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োজন। এত তথ্য কোথায়? স্থির হল, ভট্টাচার্য মহাশয় প্রয়োজনীয় সমস্ত-কিছুই দেবেন। দুর্ভাগ্য আমার, তিনি আমাকে দেবার জন্য একটি ফাইল তৈরি করলেন, যাতে সমস্ত তথ্যই ছিল—কিন্তু হঠাৎই সেটি তাঁর বাড়ি থেকে হারিয়ে গেল। এ-ঘটনার সপ্তাহখানেক পরেই তিনি চলে গেলেন দক্ষিণভারত-ভ্রমণে। কাজেই আমি তখন অকূল পাথারে।

আমিও বের হলাম তথ্যের সন্ধানে। বহু মানুষের বহু সাক্ষাৎকার, অনেক বই, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা—সে অনেক কথা। তবে এই সময়ে আমি পরিষ্কার একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি যে, পূজনীয় প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় যতই

ভারত-পর্যটনে থাকুন, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হয়েছে আমার ওপর। নতুবা এত অল্প সময়ে অভাবনীয় ভাবে এই পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয় উপকরণ-সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উচ্চস্তরের মানুষ—তাঁকে বোঝার শক্তি আমার কোথায়।

যাই হোক, পক্ষকাল পরে যখন তিনি ফিরে এলেন, ততক্ষণে আমার এই রচনা সমাপ্ত। আগাগোড়া সমগ্র বইটি তিনি পড়ে কিছু-কিছু সংশোধন করে দিয়ে আমায় ধন্য করলেন। দয়া করে ভূমিকাটিও তিনি লিখে দিলেন। এতে আমার দাম বাড়ল ঢের, কিন্তু তাঁর শুধু সময়ই নষ্ট হল। বিনিময়ে শুধুই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ছাড়া তাঁকে আমি আর কি দিতে পারি!

এই পুস্তক রচনার জন্য আমাকে বহু সুধীজনের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। সকলের নাম এখানে প্রকাশ করতে না পারায় তাঁরা যেন আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করেন।

বিশেষ সাহায্য যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে ডঃ রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী অন্যতম; বহু তথ্য ও পত্রপত্রিকা দিয়ে একাজে সহায়তা করায় আমি তাঁর কাছে ভীষণভাবে উপকৃত। স্বামী দেবানন্দ মহারাজ কয়েকটি পুস্তক ও পত্রিকা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন, তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। মাননীয় শ্রী শৈলেন ভৌমিক মহাশয়ের সহযোগিতার কথা কখনই ভোলবার নয়। শ্রদ্ধেয় কেশবজিও আমাকে তথ্যবহুল গ্রন্থ দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন।

ডঃ এস. পি. গুপ্ত, ডঃ বি. বি. লাল, ডঃ গণেশলাল ভার্মা, শ্রদ্ধেয় জি. এম. লোধা, দেওকিনন্দন, শ্রী এল. এন. সিংহ -প্রমুখের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু তথ্য আমি তাঁদের কাছে পেয়েছি। বহু জায়গাতেই আমি এদের লেখা থেকে সাহায্য নিয়েছি—গ্রন্থ-মধ্যে কোথাও-কোথাও তার উল্লেখ করেছি, কোথাও করি নি। তার কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই অনেকের বক্তব্য কোথাও সংক্ষিপ্ত কোথাও বা বিস্তৃত করতে হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্ব-হিন্দু-বার্তার সম্পাদক মহাশয়কে। ত্রয়োদশ বর্ষ থেকে ১৫শ বর্ষ পর্যন্ত প্রায় সব ক'খানি পত্রিকাই আমি ব্যবহার করেছি। লেখার মধ্যে কোথাও-বা তার উল্লেখ আছে, কোথাও নেই। এইকথা সমানভাবে প্রযোজ্য 'গৌড়কাহিনী'র আদি ও মধ্যযুগ পুস্তক-দু'খানি সম্বন্ধে। এই বই-দুটি থেকে আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি, এজন্য গ্রন্থকারকে জানাই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। মোকদ্দমার রায়ের উদ্ধৃতি নিয়েছি Justice Deoki Nandan-এর A Historical and Legal Perspective পুস্তক থেকে।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত মানচিত্র বিশ্বকোষের অনুসরণে করা হয়েছে। Front

line পত্রিকার একটি চিত্র আ।ম ব্যবহার করেছি। প্রস্তাবিত রামমন্দিরের মডেল-চিত্রটি বিচারপতি দেওকিনন্দনের পুস্তকে ব্যবহৃত। তাঁর সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে এই বইয়ে সেটি মুদ্রিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি আমার জ্যেষ্ঠা অগ্রজা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী। সংগৃহীত পুস্তক ও পত্রপত্রিকা থেকে তথ্যাদি অন্বেষণ করে আমার হাতে দিয়ে এক বিশেষ গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেছেন—তাঁর সে স্নেহ-ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়।

প্রকাশক শ্রী গোপীমোহন সিংহরায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক নয়। অনুজপ্রতিম রূপেই তিনি আমাকে সর্বত্র পরিচয় দিয়ে থাকেন। প্রকাশক নয়, একজন প্রথমসারির রবীন্দ্র-গবেষক, বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যানুরাগী ব্যক্তি হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। বাংলা বইয়ের প্রকাশনার জগতে তাঁর স্মরণীয় অবদান কবিতার বই প্রকাশনায়। অন্তরালে থেকে তিনি বাংলা কবিতার জন্য যা করেছেন, স্মরণকালের মধ্যে কোনো প্রকাশক তা করেন নি। দৃঢ়চেতা এই মানুষটি আমার এ-বই প্রকাশের মাধ্যমে আরও একবার প্রমাণ করলেন : প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ অপেক্ষা নবীনকে প্রতিষ্ঠিত করাতেই তাঁর আনন্দ। তিনি নিজে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এ-বইখানি আদ্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করে আমায় কৃতার্থ করেছেন। লেখক আর প্রকাশকের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কটাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে—লেখার মান নয়। এক্ষেত্রে হল তার বিপরীত—এ জন্য আমি গর্ববোধ করি। ঈশ্বরের কাছে আমি তাঁর শতায়ু প্রার্থনা করি।

বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কয়েকটি কথা অবশ্যই বলার দরকার। সজ্ঞানে আমি এই পুস্তক রচনায় কোনো পক্ষের মতের দ্বারা প্রভাবিত হই নি। আমার উদ্দেশ্য মূল সত্যকে যতটা সম্ভব সন্ধান করা। সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করি নি। এই বইয়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েই বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। এই বিষয়ে সাম্প্রতিককালে Koenraad Elst এর 'Ramjanma-Bhoomi Vs Babari Masjid' ছাড়া মৌলিক কোনো গ্রন্থ রচিত হয় নি। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতীয় ভাষায় আমার পুস্তকটিই একক গবেষণা এবং গ্রন্থ-রচনার প্রথম প্রয়াস। সুতরাং ত্রুটিমুক্ত না হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বাধিক বিতর্কিত এই বিষয়টির প্রকৃত রহস্য উন্মোচনে সুধী পাঠক, গবেষক ও চিন্তাশীল বিদগ্ধজনের সুচিন্তিত অভিমত সর্বদাই সাদরে গৃহীত হবে।

আগেই বলেছি, সহসা এই গ্রন্থের কল্পনা, তথ্য-সংগ্রহ ও রচনা, সম্পাদনা,

মুদ্রণ ও প্রকাশনা—স্বভাবতই এই সংস্করণে অনেক প্রমাদ থেকে গেছে। বিশেষত বিতর্কিত সৌধটির নকশার উপরিভাগে বাবরের নির্মাণকাল ১৫২৮ সালের স্থলে হয়েছে ১৯২৮। এটি অনবধান-জনিত এবং অনিচ্ছাকৃত।

যে-ভাবেই হোক ইতিহাস-বিকৃতি ঘটিয়ে সাম্প্রতিককালে যে-সত্যটিকে অন্তরাল থেকে আড়াল করা হচ্ছে, আমার প্রচেষ্টা শুধু তাকে উন্মোচিত করা। কিন্তু সে-কাজ সহজ নয়—কতটা কৃতকার্য করতে পেরেছি সুধী পাঠকই তা বিচার করবেন। এই রচনা যদি সাধারণ পাঠককে সত্য উপলব্ধিতে কিছুমাত্র সাহায্য করে তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হয়।

প্রজাতন্ত্রদিবস
২৬ মাঘ, ১৩৯৭

হরপ্রসাদ রায়

প্রস্তাবনা

রামায়ণ মহাকবি বাল্মীকির এক অপূর্ব সৃষ্টি, সাহিত্য-জগতের অফুরন্ত রসভাণ্ডার। ভাষার ঐশ্বর্যে, রসের মাধুর্যে, চরিত্র-সৃজনের মহনীয়তায় রামায়ণ সর্বযুগের সর্বকালের পরম-নির্ভর সম্পদ। গিরিকুন্তলা নদী-মেখলা পবিত্র এ ভারতভূমির আধ্যাত্মিক চেতনার মৌলিক উপাদানও প্রভূত-পরিমাণে রয়েছে রামায়ণে। তাই যুগ-যুগ ধরে এ-মহাকাব্য ভারতীয় জাতীয়-জীবনে সাধনার ধন—গার্হস্থ্য ধর্মের সমুজ্জ্বল আদর্শ। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পবিত্র স্রোতধারার ন্যায় আদিকবি-বিরচিত এ-মহাকাব্য ভারতীয় জীবনধারাকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত করেছে সুন্দরতম পরিবেশ-রচনায়। রামায়ণ একাধারে পুরাণ, ইতিহাস, সুমধুর কাব্য—সর্বোপরি আধ্যাত্মিক-চেতনার সার্থক প্রতিফলন। শ্রদ্ধা-সহকারে এর পঠন-পাঠনেও মঙ্গল হয়—

মঙ্গলং লেখনাঞ্চ পাঠনাঞ্চ মঙ্গলম্।
শ্রোতৄণাং মঙ্গলঞ্চৈব ভূমৌ ভূপতিমঙ্গলম্॥

এ-বোধ কেবলমাত্র ভারতীয় সারস্বত-সাধনায়ই নিহিত নয়, সনাতনী মনোবৃত্তির জীবনবেদের প্রতি-পদক্ষেপে সঞ্চারিত হয়ে আছে এর মূল সূত্রটি। ধর্মপিপাসু নরনারীর হৃদয়ের পবিত্র গুহায় রামায়ণের স্থান। রামায়ণ-সম্পর্কে যত বিরূপ সমালোচনাই হোক না কেন ভারত-সন্তানের হৃদয় থেকে তাকে অপসারিত করা কদাচ সম্ভব হবে না।

আদিকাব্যমিদং সর্ব্বংপুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ বৈষ্ণবীং গতিম্॥

ত্রিতাপদগ্ধ সংসারীর মুক্তিপথের পরম-নির্ভর পাথেয় রামায়ণ। এ-মহাকাব্যকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে শত-শত নাটক, উপন্যাস, গীতিকথা—কত ভাবগম্ভীর নিবন্ধ। কত ভাবে আলোচিত হয়েছে রামায়ণ-বিধৃত চরিত্রকথা। মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি-প্রমুখ উজ্জ্বল প্রতিভাধর বিদগ্ধজনও অভিভূত হয়েছেন রামায়ণের ভাববৈচিত্র্যে, রচনা-নৈপুণ্যে আর প্রকাশ-ভঙ্গিমায়। কত ভাষায় অনূদিত হয়েছে রামায়ণ তার পরিমাপ করাও কঠিন। তথাপি অদ্যাবধি রামায়ণ-সম্পর্কে শেষকথা বলা হয় নি—হয়ত-বা বলা সম্ভবও হবে না।

শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব জীবনবেদই রামায়ণের উপজীব্য-বিষয়। হর্ষ-দুঃখ-

ভাঙাগড়ার বিচিত্র ইতিহাস রচনায় মহাকবির সৃজনশক্তির এক অতুলনীয় প্রকাশ হয়েছে এ-মহাকাব্যে। শ্রীরামচন্দ্র এ-কাব্যের প্রাণপুরুষ, মূল আখ্যায়িকার প্রধানতম নায়ক। তিনি আদর্শ পুত্র, প্রেমপ্রবণ পতি আর প্রজাবৎসল রাজা। ধরাধামে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন জীবের কল্যাণে, ধর্মসংস্থাপনে। জ্ঞান তিতিক্ষার মহনীয় আদর্শে সমুজ্জ্বল এ পূত চরিত্র ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর সাধনার ধন; প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান অবলম্বন; শয়নে-স্বপনে সর্ববিষয়ে রামনাম উদ্গীত হয়ে আসছে। রাখাল -কণ্ঠে, বালক -কণ্ঠে, নারী -কণ্ঠে রামনাম; জনমে রামনাম, ক্রিয়াকাণ্ডে রামনাম, মৃত্যুতে রামনাম– রাম বিনা গতি নাই।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেষু রামনাম সমীরিতম্।
তন্নামকীর্তনং ভূয়স্তাপত্রয় বিনাশনম্॥

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণে সর্বত্র রামনাম উত্তমরূপে কথিত হয়েছে। পুনঃপুন তাঁর নাম-কীর্তন ত্রিতাপ-জ্বালা বিনাশ করে। এ -ধর্মবিশ্বাস নিয়েই ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের জয়যাত্রা। সমগ্র বিশ্ববাসী ভারতীয় এ ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়েছেন। তাই রামায়ণ ভারতের নিজস্ব সম্পদ, মৌলিক সত্ত্বার সার্থক প্রকাশ। কোন জাতির, কোন ভাষায় অথবা কোন ধর্মের প্রভাবই এতে প্রতিফলিত হতে পারে না। যারা রামায়ণের মধ্যে অপর-কোন গ্রন্থ বা জাতির প্রভাব প্রত্যক্ষ করে কাব্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁদের প্রচেষ্টা একান্তভাবেই পরানুকরণ-প্রিয়তার মোহগ্রস্থ নিদর্শন। বিপুলায়তন এ কাব্যসম্ভারে অধিগমন করার ধৈর্যের অভাব তাঁদের প্রভূত রয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সীতা শ্রীরামচন্দ্রের হ্লাদিনী শক্তি, প্রিয়তমা ভার্যা, জনকরাজ-দুহিতা। সীতা-অপহরণ ও তৎপরবর্তী সীতা-উদ্ধারের বিচিত্র আখ্যায়িকা অনুগম গতিতে সঞ্চারিত। তারই সুধারস নিরবধি পান করেছেন রসপিপাসু ভক্তবৃন্দ। আবার সীতাত্যাগের মধ্য দিয়েও শ্রীরামচন্দ্রের অপরিসীম কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। শান্ত-সমাহিত প্রকৃতির মাধুর্যময় রূপসম্ভারে পরিপূর্ণ তপোবনের সে-পরিবেশ বেদনাদগ্ধ-বিচ্ছেদকাতর হৃদয়কেও যে শান্তি প্রদান করতে পারে, আর্যঋষির সে পবিত্র সাধনক্ষেত্র একান্তভাবেই সংস্কৃতিধন্য ভারতের নিজস্ব। এ-চিত্রে বাহ্যিক প্রভাব কেবল কল্পনামাত্র।

অধিগমনমনেকা-স্তারকাঃ দীপ্তিভাজঃ,
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তি প্রভাবম্।
দিশি দিশি বিলসন্তঃ ক্ষুদ্রখদ্যোত পোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিং ন লোকৈর্ব্যলোকি॥

উজ্জ্বলরশ্মি দিবাকরের অস্তগমনেই অনন্ত গমনমণ্ডলে তারকারাজি বিলসিত হয়। গৃহে-গৃহে প্রদীপও তখন প্রভাব দেখায়। অধিক কি, ক্ষুদ্র খদ্যোতও দিগদিগন্তে বিলাস করে। সূর্য-অস্তগমনের এই পরিণতি! ভারতভূমিতে শক্তিসম্পন্ন দিকপালের আজ অভাব ঘটার দুঃখময় পরিণতির ফলেই বোধহয় রামায়ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবকে খর্ব করবার উদ্দেশ্যে শত প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু ভারতের ধর্মপ্রাণ নরনারীর হৃদয়স্পন্দন শ্রীরামচন্দ্রকে অবলম্বন করেই এখনও ধীর-স্থির ভাবে চলেছে। অমানিশার অন্ধকারে পথহারা পথিকের মত তারা কতকটা দিশাহারা হয়েছেন বটে। কিন্তু সক্ষম নেতৃত্বের অপেক্ষায় সমগ্র ভারতবর্ষ আজ অপেক্ষমান। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় ভারতের সে আশা অচিরে পূর্ণ হবে, দেশাত্মবোধের পূর্বগগনে নবীন সূর্যের উদয় হবে। পবিত্র রামনামের মহিমা কদাচ লুপ্ত হবে না—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন সরযূনদীর তীরবর্তী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অযোধ্যা নগরীতে, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রূপে। জন্ম-মরণরহিত রামরূপী সে ব্রহ্মশক্তি কেবলমাত্র জীবের কল্যাণে এসেছিলেন মর্তভূমিতে। জন্মমরণরহিত হলেও নৈসর্গিক কারণেই তাঁকেও লৌকিকদৃষ্টিতে পিতা-মাতা-পরিজন স্বীকার করতে হয়েছে। কাজেই সুখ-দুঃখ, স্বস্তি-বেদনার বিচিত্র আবর্তে শ্রীরামচন্দ্রের জীবননদী প্রবাহিত হয়েছে বিভিন্ন গতিতে। হর্ষ-বেদনার সে বিপুল কাব্যসম্ভার! রাজপুত্রের জন্ম রাজপুরীতেই সম্ভব। বর্তমান অযোধ্যানগরীই সেই পবিত্র রামজন্মভূমি—এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে আজ সমগ্র ভারতবর্ষে এক উদ্বেগময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ভারতের অধিবাসী হিন্দু-মুসলিম দুইটি সম্প্রদায়ই রামমন্দির-বাবরি মসজিদ-বিতর্কে সোচ্চার—উভয়েই নিজ-নিজ দাবির সপক্ষে যুক্তি-প্রদর্শন করে প্রচেষ্টা করছেন বহু-আলোচিত স্থানটি তাঁদের অধিকারে রাখতে। এ প্রচেষ্টার পশ্চাতে হিংসাশ্রয়ী মনোভাবও প্রকট। ধর্মীয় আবেগস্নাত এ পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার জন্য তথাকথিত রাজনীতিবিদরাও একান্ত যত্নবান। ধর্মপ্রাণ সাধারণ লোকের পক্ষে প্রকৃত বিরোধের স্বরূপ এবং সত্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজন রয়েছে প্রভূত। সে অভাবকে মেটাবার উপযুক্ত প্রচেষ্টা এখনও সংগঠিতভাবে বিশেষ দেখা যাচ্ছে না।

বর্তমান স্বল্পায়তন এ গ্রন্থে নবীন লেখক শ্রীমান্ হরপ্রসাদ রায় আবেগমথিত এ-প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। কেউ প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর গবেষণাবুদ্ধির প্রশংসনীয় পরিচয় প্রদান

করছেন না। অত্যল্পকাল-মধ্যে এমন একটি জটিল বিষয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লেখক যে যুক্তি ও বিতর্কের অবতারণা করেছেন তা চিন্তাশীল সত্যসন্ধানী ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচনার আহার্য জোগাবে। ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদের বিজ্ঞানসম্মত অভিমত অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, বর্তমান অযোধ্যাই পুরাকথিত রামায়ণে-বর্ণিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অযোধ্যানগরী। প্রথিতযশা বহু ঐতিহাসিকের সুচিন্তিত অভিমত বিচার করে লেখক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর জন্মভূমি অযোধ্যানগরী কোন বিতর্কের বিষয় নয়। এ একান্তভাবেই সনাতন ধর্মাবলম্বীর নিজস্ব সম্পদ—রাজনীতি-বহির্ভূত একটি বিষয়। সত্যসন্ধানে আলোকপাত করে নবীন লেখক অবশ্যই জনসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হবেন।

রামায়ণ ও সীতারামের পূত অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর শ্রুতিকটু মন্তব্যের অসারত্ব প্রমাণ করতে এই গ্রন্থের শেষাংশে সন্নিবেশিত লেখকের রচনাটিও বর্তমান বিতর্কের এক সুষ্ঠু সমাধান। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল, গতিও ভাবময়।

এ-গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহরায় একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি। অমায়িক, অতি সজ্জন, তদুপরি ধর্মপরায়ণ এই প্রকাশকই এ গ্রন্থ সম্পাদনায় উপযুক্ত ব্যক্তি। নবীন-প্রবীণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এ-গ্রন্থ রচনায়। শ্রীরামচন্দ্রের অপার করুণা এদের উভয়ের মস্তকে বর্ষিত হোক—এই আমার আন্তরিক কামনা। কলুষপাবন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র বর্তমান রক্তক্ষয়ী অবস্থা থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন—এই আমার সকাতর প্রার্থনা।

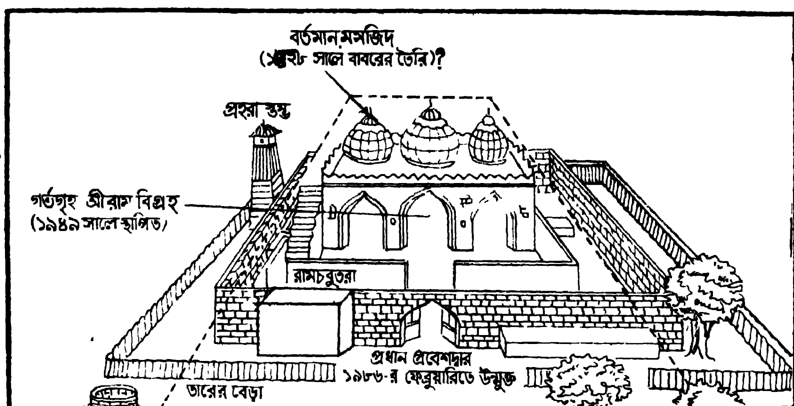
১০ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৭ — শ্রী প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে-সুরে !
... ...
জপে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা-ঊষার বেদবানী যায় মিশে কোরাণের স্বরে ;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির !
... ...
রুমের চেয়েও ভারত তোমার আপন, হেথায় তোমার ত্রাণ
—হেথায় তোমার ধর্ম-অর্থ—হেথায় তোমার প্রাণ ;
... ...
হে ভাই মুসলমান,
তোমাদের তরে কোল পেতে আছে ভারতের ভগবান !
... ...
—হিন্দুমনীষা জেগেছে এখানে আদিম ঊষায় ক্ষণে,
ইন্দ্রপ্রস্থে-উজ্জয়িনীতে-মথুরা-বৃন্দাবনে
পাটালীপুত্র শ্রাবন্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা
অজন্তা আর নালন্দা তার রটিছে কীর্তিলীলা !
—ভারতী কমলাসীনা
কালের বুকেতে বাজায় তাহার নবপ্রতিভার বীণা !
এই ভারতের তখ্‌তে চড়িয়া শাহানশাহার দল
স্বপ্নের মণি-প্রদীপে গিয়েছে উজলি' আকাশতল !
... ...
মোস্‌লেম বিনা ভারত বিফল—বিফল হিন্দু-বিনা ;
—মহামৈত্রীর গান
বাজিছে আকাশ নব-ভারতের গরিমায় গরীয়ান !

—জীবনানন্দ দাশ



বিতর্কিত সৌধটির আলোকচিত্র



বিতর্কিত সৌধ ও পার্শ্ববর্তী-অঞ্চলের নকশা

গোণ্ডা
উ
নয়া ঘাট
সরযু নদী
দ
অযোধ্যা
রাজঘাট
রামদুর্গ
প্রমোদ বন
প্রধান সড়ক
রামজন্মভূমি
হনুমানগড়ি
নবরত্ন
সুগ্রীবটিলা
রামতীর্থ

অযোধ্যা ও সন্নিহিত অঞ্চলের বর্তমান অবস্থার মানচিত্র

১

মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের কয়েকটি পংক্তি দিয়েই এ লেখার শুরু করা যাক:
'আজকাল ধর্মান্দোলনের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর ক্রমাগত মত লইয়া বিবাদ করিতে ব্যস্ত। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের যতই দোষ উদ্ঘাটন করিতে পারেন, ততই আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়েন। কোন বক্তৃতার ভিতরে যতই কোন সম্প্রদায়ের মত লইয়া নিন্দা চলিতে থাকে, ততই করতালির তরঙ্গ উঠিতে থাকে। কোন সম্প্রদায়ের কোন প্রচারক উপস্থিত হইলে অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি যাহাতে গালিবর্ষণ করিতে পারে তজ্জন্য অনুরোধ করা হয়।'

প্রায় শতবর্ষ আগে অশ্বিনীকুমার যে কথা বলেছেন, আজও তা সমান ভাবেই প্রযোজ্য। মূল সত্য থেকে সরে গিয়ে শুরু হয়েছে এমন এক কুৎসিত বিতণ্ডা, যাতে মূল বিষয়টি গৌণ হয়ে গিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। যার পিছনে রয়েছে গুটিকয় ক্ষমতালোভী মানুষের পরিকল্পিত প্ররোচনা।

সাম্প্রতিক কালে মন্দির-মসজিদ বিতর্ক একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যাকে কেন্দ্র করে একটা জাতির সংস্কৃতির উপর একটা আঘাতের চক্রান্ত। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই একথা অবগত আছেন যে, একটা জাতির চিরায়ত বিশ্বাসে আঘাত করে আর যাই হোক মহৎ কিছু করা যায় না। ইতিহাসের স্মরণীয় নায়কেরাও তা পারেন নি।

একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করেই আজকের এই জটিলতা। যার গুরুতর প্রভাব পড়বে ভারতীয় জনজীবনে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনেও। ইতিমধ্যেই যার সূত্রপাত ঘটেছে, বাকি আছে শুধু অনভিপ্রেত চরম পরিণতি। কিন্তু তাকে রোধ করার মতো সময় এখনও আছে। এখনই সচেষ্ট হলে হয়তো সেই ভয়ংকর পরিণতিকে অতিক্রম করা যায়।

সত্যনিষ্ঠ যুক্তির আলোয় বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, যাকে কেন্দ্র করে একটা দেশ এবং জাতিকে সঙ্কটাপন্ন করা প্রয়োজন। খুব সহজেই যে বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটানো সম্ভব, খুব কঠিন করেই

সেই বিষয়টি অমীমাংসিত রাখা হয়েছে। ভাঙন ধরেছে হিন্দুদের মধ্যে—উদারপন্থী বলে পরিচিত হিন্দুরা একদিকে, অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিন্দু। আরও আছে মধ্যপন্থী, যাদের আকর্ষণ প্রাচীনপন্থীদের দিকেই। আছে সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানীর দল। অপরদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও একদিকে শিয়া, অন্যদিকে সুন্নি এবং তিয়াত্তর গোষ্ঠীর অভিমত।

অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধটিকে মূলধন করে অন্তরালে একটা সর্বনাশা খেলা চলেছে। দেশের ভিতর যখনই এমন-একটা অবিশ্বাসী পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে তখনই বিদেশী নায়কেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারতবর্ষে ; নামমাত্র-যুদ্ধে আশাতীত জয়ের গৌরব লাভ করেছে—আর সেই সাফল্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে ভারতবাসীর আত্মকলহ।

সাক্ষাৎ অযোধ্যর বুকেও এ-ঘটনা ঘটেছে ইংরেজ আমলে। যেদিন হিন্দু-মুসলিম এক হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে দানা বেঁধেছিল, সেদিনই ইংরেজ এই গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়েছিল। মাইকেল এইচ. ফিসারের 'এ ক্লাশ অব্ কালচারস্ : অবোধ, দি ব্রিটিশ এ্যাণ্ড মোগল'-গ্রন্থে এর প্রমাণ আছে। আজকের পরিস্থিতিও যেন সেই অতীত ইতিহাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

কিন্তু কেন? একটি সুপ্রাচীন সংস্কৃতি, তা সে যে-সম্প্রদায়েরই হোক, তা সব সময়েই জাতি-ধর্ম, সম্প্রদায় ও সাময়িক প্রশাসনের অনেক উর্ধ্বে। একটি প্রাচীন সংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়নে, একটি সত্যকে স্বীকার করার মধ্যে একটি প্রশাসনের পরিচ্ছন্ন রূপটিই প্রকাশিত হয়।

স্মরণাতীত কাল থেকে যে-জায়গাটিকে কেন্দ্র করে লক্ষকোটি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিপুষ্টি লাভ করেছে, জন্ম হয়েছে এক সুগভীর দর্শনের—দৃঢ়তর হয়েছে ভারতীয় সনাতন ধর্মের আদর্শ, এ-দেশের সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে তৈরি করেছে একটি জাতির মেরুদণ্ড—তার মূল অনুসন্ধানে অহেতুক এত বিলম্ব কেন?

সমস্যাটি এখন আর রামচন্দ্রের জন্মস্থান-নির্ণয়ের নয়, তথাকথিত জন্মভূমির উপর নির্মিত সৌধটির মালিকানার প্রশ্নেও। বাল্মীকি-রামায়ণের নায়ক দাশরথি রাম অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দশরথ ছিলেন কোশল-নামক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং তাঁর রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা। অতএব এককালে সমগ্র এলাকাটাই যে শ্রীরামচন্দ্রের ছিল, এমন বিশ্বাসই স্বাভাবিক।

শুধুমাত্র পুরাতাত্ত্বিক রিপোর্টের ভিত্তিতেই অন্তত এই প্রশ্নের সমাধান

হতে পারত। বাবরের সময়কাল ১৫২৬ থেকে ১৫৩০ খ্রী.—অর্থাৎ এখন থেকে মাত্র ৪৬৪ বছর। আর তাঁর মসজিদ-নির্মাণের কাল আরও দুবছর কম; অর্থাৎ ৪৬২ বছর মাত্র। পুরাতাত্ত্বিক রিপোর্টে অন্তত এটুকু প্রমাণিত যে, বিতর্কিত সৌধটির বয়স আট থেকে নয়শত বছর। তখন বাবর কোথায় (যদিও এ পুরাতাত্ত্বিক রিপোর্টের সঙ্গে আমরা একমত নই)। কিন্তু বাবর জন্মাবার ৪০০ বছর আগে বাবরি মসজিদ নির্মিত হওয়া অথবা তা রামচন্দ্রেরই রাজধানী ও বাস্তুভিটা কিংবা কোনো মন্দিরের উপর নির্মিত হওয়া—কোনটিই মুসলিম বিশ্বাস করেন না।

বিতর্কিত সৌধটির ক্ষেত্রে হিন্দুদের দাবির কারণ তার শ্রুতি, স্মৃতি ও লৌকিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং তা ঐতিহাসিক কালের বহু পূর্বের ' বাবরের আগমনের বহুপূর্ব থেকেই এই স্থানে হিন্দুগণ বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামের জন্মস্থান জেনে পূজা-প্রণাম, শ্রদ্ধা-প্রার্থনা নিবেদন করে এসেছে। তাহলে মসজিদ পক্ষের বক্তব্য? বলা বাহুল্য তার উত্তর অযোধ্যায় নেই, আছে বাগদাদের এক পরিকল্পনায়—যে পরিকল্পনার প্রায় ৫০০ বছর পরে বাবরের জন্ম। বাবর তার শিকার হয়েছিলেন মাত্র।

বিশেষ বিতর্কের ভিতর না গিয়ে মসজিদ-নামাঙ্কিত মন্দিরটির হারানো কোষ্ঠী উদ্ধার করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। যার উপর ভিত্তি করে বিগত ৪৫০ বছর নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে। আমরা দেখব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ভাস্কর্যশিল্প, শিলালেখ এবং ঐতিহাসিক তথ্য—আরও দেখব, দুই বিবাদমান গোষ্ঠীর আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের ধারাবাহিকতা। সেইসঙ্গে আরও দেখব, ন্যায়ালয়ের রায় ও প্রশাসনিক উপেক্ষার অন্তরালে ঘটনার মূল স্রোতকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার অর্থবহ প্রচেষ্টা।

'পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র আর প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ যুগ-যুগ ধরে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনার স্রোতধারায় রসসঞ্চার করে আসছেন। শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ রাজা, এবং সর্বোপরি তিনি হিন্দুর প্রাণপুরুষ, পরমারাধ্য দেবতা। পবিত্র নিষ্ঠাবোধই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যাকে করেছে পুণ্যতীর্থ, ভক্তগণের পরম পবিত্র দর্শনীয় স্থান।' রামচন্দ্র হলেন রামায়ণের নায়ক—বিশ্বত্রাস রাবণকে নিহত করে ধার্মিকজনের তপস্যার পবিত্র পরিমণ্ডল গড়ে দিতে তাঁর মানুষীরূপ; সীতা তাঁর তটস্থাশক্তি। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, তাঁরই অংশ। রামচন্দ্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ; ত্রেতাযুগে

তাঁর আবির্ভাব। কারো-কারো মতে, তাঁর সত্যতা রামায়ণকাব্যেই সীমিত, বাস্তবে কখনো ছিল না। রামচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা যদি সত্য না হয়, তাহলে তৎপূর্ববর্তী বলিরাজার কাহিনী, ইক্ষাকু-বংশীয় নৃপতিগণ, সগররাজা এবং কপিল মুনির কাহিনীও অসত্য।

পূর্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্নকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব উত্তরসূরীদের। উত্তরসূরী যদি-সে কাজ যথাযথভাবে না করে, তাহলেও তাঁরা কখনো মিথ্যা হয়ে যান না। শ্রীরামচন্দ্র কারো কাছে অবতার, কারো কাছে মানুষ। রামচরিত্রে অবতারত্ব আরোপ করলে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব যে একটা বাড়ে তা নয়; তাঁকে মানুষরূপে গণ্য করলেও তাঁর দেবচরিত্রের মূল্যও কমে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামচন্দ্র একটি সত্যের প্রতীক, আদর্শের প্রতীক, একতার প্রতীক, চিরকালের মানবের অনুসরণীয় একটি আদর্শ। তিনি ছিলেন একান্নবর্তী পরিবারেরও আদর্শ—ন্যায়, নীতি, ধর্ম ও সত্যের আকর। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত:

'কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন, পণ্ডিতেরা ইহার প্রমাণ করিবেন।···

'বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া·· নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন···কোন্ একটিমাত্র নরকে আশ্রয় কবিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপগ্রহণ করিয়াছেন, তখন নারদ কহিলেন···"এত গুণযুক্ত পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যে দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।"

'রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।···

'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে।···পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।···

'গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রমধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাসদুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে।···

'ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।...

যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন...তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে, মানবসভ্যতা আপন ধূলিধূমসমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের জনতা-মধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে-পলে পীড়িত হইয়া, কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে। রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র্য, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা-ঘরের বাতায়ন-মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মলবায়ু প্রবেশের পথ পাইবে। [রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ৬৬২ (৪)-৬৬ (৭)]

এমন এক মহৎ পুরুষের স্মৃতিরক্ষার মধ্যে দিয়ে একটি দেশ সবচেয়ে বেশি গৌরব বোধ করতে পারে। দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে মানব-চৈতন্যে নিয়ত বর্তমান থেকে অনন্তকাল তিনি জনজীবনকে পরিচালিত করছেন। পরিতাপের বিষয়, এ-দেশের কর্ণধারগণ আজ তাঁর অনস্তিত্ব প্রমাণেই বিশেষ আগ্রহী।

২

প্রাচীন অযোধ্যার অস্তিত্ব এবং সেখানে রামজন্মভূমির অবস্থান সম্পর্কে ভৌগোলিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি আছে, দেখা যাক।

'অষ্টাচক্র নবদ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥

[অথর্ববেদ : ১০।২।৩১]

মূলাধার, নবদ্বারাদি অষ্টচক্র-সমন্বিত অযোধ্যাপুরীর অভ্যন্তর স্বর্ণমণ্ডিত; জ্যোতিঃবিমণ্ডিত স্বর্গতুল্য। অথর্ববেদ এই অযোধ্যা-নগরীকে ব্রহ্মময়ী বৈকুণ্ঠ বলে অভিহিত করেছে। বিরজানদী ও রত্নকোষার দক্ষিণ-পুলিনে অবস্থিত অযোধ্যা হল রামসীতার নিত্য-বিহারভূমি। তার ভৌগোলিক অবস্থান ২৬°৪৮" উত্তর-অক্ষরেখা এবং ৮২°১৩" পূর্ব-দ্রাঘিমার মধ্যে। সেই নগরী ঘর্ঘরা ও সরযূনদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত।

অযোধ্যা-প্রদেশের মধ্যে গঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, সরযূ ও রাপ্তি—এই কটিই প্রধান নদী। এছাড়াও এই নগরীর চারিপাশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। অযোধ্যা বা আউধ-প্রদেশ কোশল-নামে প্রসিদ্ধ। পুরাকালে কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল অযোধ্যা। এই প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে নেপালরাজ্য; উত্তর-পশ্চিমভাগে রোহিলখণ্ড; দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা; পূর্বদিকে বস্তী-অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বে বারাণসী বিভাগ। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে অযোধ্যা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুদূর অতীতকাল হতে এই নগরী ক্রমান্বয়ে সব-কিছুই ত্যাগ করেছে। বর্তমানে এই মহান নগরী শ্রীরামচন্দ্রের রাজবাটীর অংশটুকুতেই সীমাবদ্ধ।

পূর্বে যখন অযোধ্যা পৃথক প্রদেশ-রূপে বর্তমান ছিল, তখন এই প্রদেশের প্রধান চারটি বিভাগ ছিল: যথা, লক্ষ্ণৌ, সীতাপুর, রায়বেরিলি ও ফৈজাবাদ। উল্লিখিত বিভাগগুলির প্রত্যেকটির আবার তিনটি করে উপবিভাগ ছিল।

লক্ষ্ণৌ-বিভাগের উপবিভাগগুলি হল: লক্ষ্ণৌ, উনাও ও বারবাকি। সীতাপুরের অন্তর্গত উপবিভাগগুলি যথাক্রমে: সীতাপুর, হর্দই এবং খেরী।

রায়বেরিলির অধীনস্থ উপবিভাগগুলির নাম: রায়বেরিলি, সুলতানপুর এবং প্রতাপগড়।

আকবরের সময়ে অযোধ্যাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। এই প্রদেশের এক-অংশ যুক্ত করা হয় জৌনপুরের সঙ্গে, অন্য-অংশটি সংযুক্ত করা হয় এলাহাবাদ সুবার সঙ্গে। ইংরেজ আমলে আউধ প্রদেশের পরিমাণ ছিল ২৩,৯৯২ বর্গ মাইল। এইভাবে শাসক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে অযোধ্যার অবয়ব বিস্তৃত, কখনও সঙ্কুচিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

এই-মুহূর্তে অযোধ্যা বলতে যা বোঝান হয় তা হল, মূলত শ্রীরামচন্দ্রের রাজপুরীর অংশটুই। প্রতি বছর কার্তিক মাসে অগণিত রামভক্ত চৌদ্দক্রোশী ও পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় অযোধ্যাকে প্রদক্ষিণ করে। এবং কার্তিক-পূর্ণিমায় ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। চিরায়ত এই প্রথা থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, রামচন্দ্রজীর মূল রাজপুরীর চতুঃসীমা দৈর্ঘ্যে চৌদ্দক্রোশ এবং প্রস্থে পঞ্চক্রোশ হওয়াটাই সম্ভব।

বর্তমান অযোধ্যার ভৌগোলিক সীমার উত্তরে রয়েছে গোণ্ডা, পূর্বে বস্তী, দক্ষিণ-পূর্বে গোরক্ষপুর, উত্তর-পশ্চিমে বড়বাঁকি, দক্ষিণে ফৈজাবাদ। অযোধ্যায় প্রবেশ-পথের উত্তরে গোণ্ডা ও সরযূ নদী এবং সরযূ-নিকটস্থ নয়াঘাট; পশ্চিমে রাজঘাট; পূর্বে প্রমোদবন ও দক্ষিণে পেয়ারা-বাগান ও মণিপর্বত।

'অযোধ্যার মধ্যে রামকোট বিশেষ প্রসিদ্ধস্থান। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র এইখানে দুর্গনির্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গের চারিদিকে বিশটি বুরুজ ছিল। হনুমান, সুগ্রীব, জাম্বুবান প্রভৃতি সেনাপতিরা সেই বুরুজের উপরে থাকিয়া নগর রক্ষা করিতেন। দুর্গের ভিতর ৮টি রাজপ্রাসাদ ছিল।' [•বিশ্বকোষ, পৃ. ৫১৮] মূল বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডে অযোধ্যার বর্ণনা এইরূপ:

'স্রোতস্বতী সরযুর তীরে প্রচুর ধন-ধান্য-সম্পন্ন আনন্দকোলাহলপূর্ণ অতি-সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-প্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথসকল বিকসিত-কুসুম-সমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণসকল রহিয়াছে। কোনস্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র সঞ্চিত আছে। কোনস্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ

অট্টালিকায় ধ্বজপটসকল বায়ুভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহ-নির্মিত শতঘ্নী-নামক যন্ত্র-বিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালাসকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আম্রবনসকল স্থানে-স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানা দেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু-মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ন-নির্মিত প্রাসাদ পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্ত গৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। তথাকার স্বর্ণখচিত প্রাসাদসকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্যতণ্ডুল ও নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায় উহা সর্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে।' [পঞ্চম সর্গ, বালকাণ্ড, বাল্মীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-অনূদিত, পৃ. ৪২]

এখানে তৎকালীন অযোধ্যাপুরীর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। এই বর্ণনায় লৌহের ব্যবহারের উল্লেখ থাকায় অনেক ঐতিহাসিক অথবা বৈজ্ঞানিক সংশয়িত। তাঁদের মতে মহাভারতের আমলেও লৌহের ব্যবহার প্রচলিত হয় নি—রামায়ণের কী কথা? কিন্তু, আমরা ঋগ্বেদেই পাই :

'চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্।
সদ্যো জংঘামায়সীং বিশ্পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম॥'

[ঋকবেদ ১।১১৬।১৫, রমেশ মজুমদার-অনূদিত, পৃ. ১৫১]

(অর্থাৎ খেলের ভার্যা বিশপলার একটি পা পক্ষীর একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হয়েছিল; হে অশ্বিদয় তোমরা নিশাযোগে সদ্যই বিশপলাকে গমনের জন্য এবং শত্রুন্যস্ত ধনলাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরিয়ে দিয়েছিলে)।

এর থেকে বোঝা যায়, রামায়ণের আমলে লৌহের ব্যবহার খুব উন্নত ধরণেরই ছিল। যাই হোক, রামায়ণে বলা হয়েছে: রাজা দশরথ ছিলেন একজন স্বাধীন রাজা। তাঁর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল যে, সে-নগরী অধিকার করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।

'কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল।' [বালকাণ্ড, বাল্মীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৪]

সরযূনদীর উত্তর তটে রাজা দশরথ বিশাল অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টিযজ্ঞের আয়োজন করেন। রামায়ণে সেই যজ্ঞের বিশাল বর্ণনা আছে। সেখানে যে ভৌগোলিক বর্ণনা রয়েছে, তাও বর্তমান অযোধ্যারই অনুরূপ। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র বারংবার সরযূতীরে মৃগয়ার সুখস্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। নৃপতি দশরথ সরযূনদীতেই মৃগভ্রমে অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করেন।

মাতুলগৃহ থেকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনকালে ভরত যে পথ দিয়ে আসেন, বাল্মীকি-রামায়ণে তার বর্ণনা এরূপ :

'মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্বাভিমুখে নির্গত হইয়া সর্বাগ্রে সুদামা-নাম্নী এক নদী পার হইলেন। পরে হ্রাদিনী-নামে পশ্চিমবাহিনী অতি বিস্তীর্ণা এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর ঐলধান নামক গ্রামে আর-একটি নদী পার হইয়া অপরপর্বত নামে জনপদসকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে শিলা ও আকুর্বতী-নাম্নী দুই নদী সন্তরণ করিয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা-নাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইতেছিল; সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরত পবিত্র হইয়া সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চৈত্ররথ কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা-সরস্বতীসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বীরমৎস্য দেশের উত্তরে যে-সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া ভারুণ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্বতপরিবৃতা বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদূরে কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন।···

··পরে অংশুধান গ্রামে গমন পূর্বক তথায় গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর দেখিয়া প্রাগ্বটপুরে চলিলেন এবং ঐ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া কুটিকোষ্টিকা নদীতে উপনীত ও সৈন্যগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া ধর্মবর্ধন-গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে, জম্বুপ্রস্থ হইতে বরূথ জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ স্থানের এক সুরম্য বনে বিশ্রাম করিয়া যথায় প্রিয়ক নামক বৃক্ষসকল রহিয়াছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানে চলিলেন। অনন্তর তিনি ঐ সকল বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়া একাকী দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে সর্বতীর্থ গ্রামে উপনীত হইয়া বহুসংখ্য পার্বত্য তুরগের সহিত স্রোতস্বতী উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। অদূরেই হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী বহিতেছিল,

তিনি তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরে শালবন পার হইয়া রাত্রিশেষে পরিশ্রান্ত অশ্বে অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন।' [একসপ্ততিতম সর্গ, অযোধ্যাকাণ্ড, বাল্মীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ২৪৭]

উল্লিখিত ভৌগোলিক বর্ণনায় যে সকল নদী ও দেশের বর্ণনা আছে প্রাচীন ভারতের মানচিত্রের সঙ্গে তার মিল আছে। তাছাড়া এই বর্ণনার ভৌগোলিক অনুপুঙ্খতা সেকালে অযোধ্যার অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করে। আর সেই অযোধ্যাই ছিল রামরাজ্যের রাজধানী।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময় রাজা দশরথ যে-সমস্ত নৃপতিগণকে আমন্ত্রণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: মিথিলাপতি জনক, কেকয়রাজ, কাশিরাজ, অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ, তেজস্বী কোশলরাজ, মগধরাজ -প্রমুখ। এছাড়া আরও ছিলেন পূর্বদেশীয় সিন্ধু ও সৌবীরদেশীয়, সৌরাষ্ট্রদেশীয় এবং দাক্ষিণাত্যরাজগণ। [দ্বাদশ সর্গ, বাল্মীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ৫২]

সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্।
মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদীনম্॥ ২১
... .
তথা কাশিপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্।
সদ্‌বৃত্তং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্বহ॥ ২৩
তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্মিকম্।
শ্বশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয়॥ ২৪
তথা কোশলরাজানং ভানুমন্তং সুসৎকৃতম।
অঙ্গেশ্বরং মহেশ্বাসং রোমপাদং সুসৎকৃতম॥ ২৫
বয়স্যং রাজসিংহস্য সমানয় যশস্বিনম্।
মগধাধিপতিং শূরং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্॥ ২৬
প্রাপ্তিজ্ঞং পরমোদারং সৎকৃতং পুরুষর্ষভম্।
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় চোদয়স্ব নৃপর্ষভান্॥ ২৭
প্রাচীনান্ সিন্ধুসৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ পার্থিবান॥
দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানানয়স্বহ॥ ২৮
সন্তি স্নিগ্ধাশ্চ যে চান্যে রাজানঃ পৃথিবীতলে॥ ২৯

[ত্রয়োদশঃ সর্গঃ, আদিকাণ্ড, বাল্মীকি-রামায়ণ, পঞ্চানন তর্করত্ন, পৃ. ২৭]

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে অনুমিত হয়, সেকালে অযোধ্যা কত প্রভাবশালী রাজ্য ছিল। রামায়ণের সর্বত্র অসংখ্য ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিবরণ রয়েছে। যেগুলি অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে: সেকালে অযোধ্যার অস্তিত্ব ছিল।

স্কন্দপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র জন্মস্থানের চতুর্দিকের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে:

'বিঘ্নেশ্বরাৎ পূর্বভাগে, বশিষ্টদুত্তারে তথা।
লোমশাৎ পশ্চিমভাগে জন্মস্থানম ততঃ স্মৃতম্।'

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের পূর্বদিকে দেবাদিদেবের মন্দির, উত্তরদিকে বশিষ্ঠাশ্রম এবং পশ্চিম দিকে লোমশ মুনির আশ্রম।

অযোধ্যায় গেলে এখনও বশিষ্ঠাশ্রম বলে চিহ্নিত একটি স্থানকে দেখানো হয়; দেখানো হয় লোমশের আশ্রমও। পূর্বে উক্ত স্থানগুলিতে যা-যা ছিল, শ্রুতি ও স্মৃতি-পরম্পরায় আজও তা অমলিন রয়েছে।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান সম্পর্কে বিশ্বকোষের মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: 'অযোধ্যায় গেলে এখন আমরা রামলীলার অনেকগুলি বিবরণ দেখিতে পাই। পাণ্ডারা সঙ্গে-সঙ্গে গিয়া যাত্রীদিগকে সেইসকল বিবরণ বুঝাইয়া দেয়। রাম ভূভারহরণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জন্মস্থান এখনও রহিয়াছে। এখানে কোন মূর্তি নাই; কেবল শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-অঙ্কিত পাদপদ্মের চিহ্ন পড়িয়া আছে।' [বিশ্বকোষ ১, পৃ. ৫১৯]

'গুপ্তঘাটে একটা সুড়ঙ্গ আছে। পাণ্ডারা বলে, ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া রামচন্দ্র সরযূ-জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।... ঘর্ঘরা হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে কর্ণালগঞ্জের কাছে অগস্তমুনির সমাধিস্থান।' [তদেব, পৃ. ৫২০]

বিশ্বকোষে উল্লিখিত এই তথ্য স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী যুগে সংগ্রহ করা হয়েছে। তখন শ্রীরামলীলাবিগ্রহ প্রকট হয় নি।

বহু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থেও অযোধ্যার উল্লেখ আছে। তৎকালীন ভারতবর্ষের ছয়টি বৃহৎ নগরীর মধ্যে অযোধ্যা ছিল অন্যতম। এই নগরীর খ্যাতি ও প্রাচুর্য্য গ্রীক আক্রমণকারীদেরও আকৃষ্ট করে। পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতা থেকে জানা যায় যে, অযোধ্যা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার শহরগুলি গ্রীকদের দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হয়। এতৎসত্ত্বেও অযোধ্যানগরী গুপ্তযুগ পর্যন্ত তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল।

এসব প্রমাণ সত্ত্বেও একদল ঐতিহাসিক রামায়ণে-বর্ণিত সরযূতীরস্থ

অযোধ্যার বর্তমান অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বলেন : হয়তো সে অযোধ্যা ছিল কোনকালে, কিন্তু এখন তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁদের আরও অভিমত হল, রামায়ণে কোশল-মহাজনপদের রাজধানীর নাম অযোধ্যা। অন্যদিকে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে 'সাকেত'কে কোশলের রাজধানী বলা হয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন : একই জায়গার দুটি নাম হয় কি করে? এ-প্রশ্ন যতখানি না হাস্যকর তার চাইতে দুশ্চিন্তার—কারণ হিন্দুরা যে-অযোধ্যাকে রামজন্মভূমি এবং কোশলের রাজধানী বলে দাবি করছে তাকে যদি জৈন বা বৌদ্ধদের অযোধ্যা বানিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অন্য-এক সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি। এই সংশয়ীরা অভিধানেই পাবেন : 'সাকেত ক্লী অযোধ্যা, অযোধ্যাপুরি। রামে···সাকেতং পুনরাগতে গো. রা. ২.৩৮.৩৪।' [বঙ্গীয়-শব্দকোষ ২, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২১৮১]

ভারতবর্ষের প্রচলিত নয়টি দর্শনের মধ্যে ছয়টি হল আস্তিকদর্শন, আর বাকি তিনটি হল নাস্তিক। এখানে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দ-দুটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে নয়। বেদের উপর যারা সরাসরি আস্থাশীল, বা বেদকে অপৌরুষের বলে স্বীকার করেন তাঁরাই হলেন আস্তিক, আর যারা তা স্বীকার করেন না তাঁরা হলেন নাস্তিক। বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্য-দর্শন বেদকে প্রথমে স্বীকার না করলেও পরোক্ষভাবে তাকে সমর্থন করেছেন। তা ছাড়া, নব্যন্যায় এবং সাংখ্য, শঙ্করাচার্যের সময় থেকে ঈশ্বরকেও স্বীকার করেন! যাই হোক, বেদকে যে-ভাবেই হোক যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরাই হিন্দু। সর্বোপরি বুদ্ধের সময়কাল খ্রী.পূ. ৫০০ বছর। আর শ্রীরামচন্দ্রের সময় অন্ততঃ খ্রী.পূ. ৪০০০ বছর। অতএব বৌদ্ধগণের অযোধ্যা আর রামচন্দ্রের আযোধ্যা এক হতে বাধা কী! তাছাড়া বৌদ্ধমঠ অযোধ্যায় ছিল, এখনো আছে।

যাই হোক, অযোধ্যাই যে সাকেত তার প্রমাণ আছে মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে। সময়ের হিসাবে তা খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতক ; অর্থাৎ, এখন থেকে দেড়-হাজার বছর পূর্বেই মহাকবি এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেখেছেন। রঘুবংশের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতেই তার পরিচয় রয়েছে :

·· জনস্য সাকেতনিবাসিনস্তৌ দ্বাবপ্যভূতামভিনন্দ্য-সত্ত্বৌ।
গুরুপ্রদেয়াধিক-নিঃস্পৃহোঽর্থী নৃপোঽর্থিকামাদধিক-প্রদশ্চ॥ ৫।৩১
···ক্রোশার্দ্ধং প্রকৃতিপুরঃসরেণ গত্বা কাকুৎস্থঃ স্তিমিতজবেন পুষ্পকেণ।
শত্রুঘ্নপ্রতিবিহিতোপকার্য্যমার্য্যঃ সাকেতোপবনমুদারমধ্যুবাস॥ ১৩।৭৯

…বলিক্রিয়াবর্জিত সৈকতানি স্নানীয়সংসর্গমনাপ্নুবন্তি
উপান্তবানীরগৃহানি দৃষ্ট্বা শূন্যানি দূয়ে সরযূজলানি। ১৬।২১
কুশাবতীং শ্রোত্রিয়সাৎ স কৃত্বা যাত্রানুকূলেঽহনি সাবরোধঃ॥
…অনুদ্রুতো বায়ুরিবাভ্রবৃন্দৈঃ সৈন্যৈরযোধ্যাভিমুখঃ প্রতস্থে॥ ১৬।২৫

উপরিউক্ত শ্লোকগুলিতে অযোধ্যাই যে সাকেত এবং কালে তা সৌভাগ্যহীন জনশূন্য হয়, তারও পরিচয় পাই। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে হূন-বিজয়ী গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে অযোধ্যায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি তাঁর শিলালিপিতে নিজেকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং অযোধ্যাই যে সাকেত সে কথা নিজেই বলে গেছেন।

রঘুবংশে অযোধ্যা ও সাকেত শব্দ-দুটি পর্যায়-বাচক হিসাবে বারংবার প্রযুক্ত হয়েছে। প্রাচীন তীর্থস্থানগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটির নামই এইরকম যুগ্ম-নাগরী-বাচক। যেমন কাশী-বারানসী, প্রয়াগ-প্রতিষ্ঠানপুর, পাটলিপুত্র-কুসুমপুর-ইত্যাদি যুগ্মনামে পুরাণাদিতে উল্লিখিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বর্ণনানুসারে অযোধ্যা হল ইক্ষ্বাকুবংশের রাজধানী। সগর রাজা এখানে রাজত্ব করতেন; শ্রীরামচন্দ্রের তিনি পূর্বপুরুষ।

ফা-হিয়েন-কথিত সা-চে সাকেতের বিকৃত উচ্চারণ কিনা ভেবে দেখা দরকার। স্কন্দপুরাণে অযোধ্যাকে মৎস্যাকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গয়া তাম্রফলকে স্কন্দগুপ্তও অযোধ্যাকে প্রাচীন শহর বলে উল্লেখ করেছেন। [Historical Geography of Ancient India]

বৌদ্ধগ্রন্থ সংযুক্ত-নিকায়ে বলা হয়েছে : 'এক সায়ং ভগব অযোধং বিহরতি গঙ্গয় নদিয় তীরে।' (অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ একসময় গঙ্গাতীরস্থ অযোধ্যায় বিহার করেছিলেন।) কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে অযোধ্যাকে সরযূতীরস্থ বলা হয়েছে। বাস্তবে আছেও তাই। তাহলে? তার উত্তর 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র প্রাক্তন ডাইরেক্টর-জেনারেল অধ্যাপক ডঃ বি. বি. লালের কাছ থেকেই জানা যাক। ডাঃ লাল তাঁর Ayodhya of the Valmiki Ramayana; An Energising Debate on its Identification Archaeology' [No. 16, 1985-86, p. 79-84]-প্রবন্ধে বলেছেন, প্রাচীন ভারতে যে কোনো পবিত্র নদীর ক্ষেত্রেই গঙ্গা-শব্দের প্রয়োগ করা যেতে পারত। সংযুক্তনিকায় প্রথম খণ্ডে 'অসিবিসবগো' অথবা 'সলয়তন' সময়ুক্তমে'-এর প্রারম্ভে বলা হয়েছে, 'এক সায়ম ভগব

কোসাম্বিয়ম বিহরতি গঙ্গয় নদি' (অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ একদা গঙ্গা-তীরস্থ কৌশম্বী নগরে কিছুকাল বসতি করেন)।

কৌশম্বী-নগরী এলাহাবাদ থেকে ৫৮ কিমি দূরে যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। অধ্যাপক লাল ত্রিকূট-প্রসঙ্গেও বলেছেন, 'সেই স্থানের মন্দাকিনী নদীকে স্থানীয় মানুষ আজও গঙ্গা বলে।' পশ্চিমবঙ্গেও উত্তর ২৪ পরগণার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইচ্ছামতী নদীকে সেই জনপদের অনেকে যমুনা বলে। তাছাড়া শাস্ত্রে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী—এই সপ্তপ্রবাহের পবিত্র সলিলকে গঙ্গার সমতুল্য জ্ঞান করা হয়।

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরী, সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

তাছাড়া আরও একটি কথা। রামায়ণ-বর্ণিত অযোধ্যা নগরী ১০৮ মাইল দীর্ঘ, এবং ২৭ মাইল প্রস্থ। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের সময় কালের অযোধ্যা শুধু সরযূতীরেই সীমাবদ্ধ নয়, গঙ্গা ও যমুনাতীরেও বটে। কিন্তু রামচন্দ্রের রাজপ্রাসাদটি সরযূতীরস্থ বর্তমান স্থলেই। তার প্রমাণ:

'সরযূতীর মন্দার বেদি পঙ্কজাসনে।
শ্যামং বীরাসনাসীনং জ্ঞানমুদ্রোপশোভিতম্॥'

উক্ত মন্ত্রে রাম-রঘুবীরের ধ্যান করা হয়ে থাকে। যাই হোক ডঃ লালের মতে: হয় বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ ভূগোল-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না; নয়ত তাঁরা নদীমাত্রকেই বোঝাতে গঙ্গা-শব্দের প্রয়োগ করেছেন। মনে হয়, দ্বিতীয়টিই ঠিক।

বিরুদ্ধবাদী ঐতিহাসিকদের আরও অভিমত এই যে, রামায়ণে যখন অযোধ্যাকে সরযূনদীর দক্ষিণতীর থেকে অর্ধযোজন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন এই অযোধ্যা রামায়ণের সেই অযোধ্যা নয়। আবার উত্তরকাণ্ডে রাম যখন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের পথে গোপ্রতার নামক স্থানে এলেন, তখন সেখানে সরযূকে পশ্চিম-বাহিনী বলা হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব? সরযূনদী তো পূর্ব-প্রবাহিনী।

এর উত্তর শুধুমাত্র ইতিহাসেই মিলবে না। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার রিপোর্টও দেখা প্রয়োজন। ঘটনা যেহেতু অন্তত খ্রী.পূ. ৪০০০ বছর পূর্বকালের, সেখানে সত্যানুসন্ধানের জন্য জিওফিজিক্সের সহায়তা প্রয়োজন। যাই হোক, পূর্বপ্রশ্নের উত্তর আগে দেওয়া যাক। ডঃ লালের মতে: উক্ত ঐতিহাসিকদের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। এক যোজন হল ৯ মাইল বা ১৪.৫ কিলোমিটার। তাহলে

অর্ধযোজনের দূরত্ব ৭½ কিলোমিটার বা সাড়ে-চার মাইলমাত্র। রামায়ণে আছে :

'মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্ধযোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণতীরে "রাম" এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্বক কহিলেন, বৎস, তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর।' এই কথা শুনে রাম সেই নদীজলে আচমন করলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁকে 'বলা' ও 'অতিবলা' নামক দুই মন্ত্র প্রদান করলেন। যে মন্ত্রের প্রভাবে তাঁর আর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রইল না। অতঃপর তাঁরা সেরাত্রি সরযূতীরে অবস্থান করলেন। অযোধ্যা নগরীর রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে জনপদ ছাড়িয়ে সরযূতীরস্থ কতকটা নির্জন জায়গায় আসতে মাইল ৫।৬ হাঁটতে হয় না কি? যাঁরা অযোধ্যায় গেছেন তাঁরা কি বলেন?

রামায়ণে-বর্ণিত সেই গোপতরু গোপ্রতার ঘাট, মধ্যযুগের 'গোপতার', বর্তমানে 'গুপ্তার ঘাট' নামে পরিচিত। অযোধ্যা থেকে তার দূরত্ব খুব বেশি হলে মাইল ৫।৬ হবে। শ্রীরামচন্দ্র সরযূর সেই ঘাটেই সলিল-প্রবেশ করেন। বাল্মীকি-রামায়ণের শেষাংশে তার বিবরণ রয়েছে :

'তখন বশিষ্ঠদেব বিধানানুসারে মহাপ্রাস্থানিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মাম্বরধারী রাম দুই হস্তের অঙ্গুলিতে কুশ ধারণ ও বেদোচ্চারণ পূর্বক সরযূ-তীরে চলিলেন। · মহাত্মা ঋষি ও মহীসুরসকল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বালবৃদ্ধ দাসী ও ক্লীব কিঙ্করের সহিত অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রী সস্ত্রীক ভরত ও শত্রুঘ্ন অগ্নিহোত্রের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মন্ত্রী, ভৃত্যবর্গ, পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে যাইতে লাগিল। গুণানুরক্ত প্রজারা চলিল। পশুপক্ষীর সহিত এই সমস্ত স্ত্রীপুরুষ স্নাত নিষ্পাপ ও হৃষ্ট হইয়া তুমুল কোলাহলের সহিত রামের অনুগমন করিতে লাগিল। ·· এইরূপ দৃশ্য আর কেহ কখন দেখে নাই। ·· রাম যখন বহির্গত হইলেন তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে-কেহ আইল সেও তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্বর্গলাভার্থ তাঁহার সঙ্গে চলিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষস এবং পুরবাসী লোকেরা পরমভক্তির সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। নগরমধ্যে অন্যের অদৃশ্য যে-সমস্ত জীব ছিল তাহারাও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে, যাহারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং যাহারা চক্ষের অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম তাহারা সকলেই রামের সমভিব্যাহারে চলিল।' [নবাধিকশততম সর্গ, বাল্মীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ৯৪৩-৯৪৪]

'এইরূপে রাম অর্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবাহিনী

পুণ্যসলিলা সরযূকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ তরঙ্গসঙ্কুল আবর্তবহুল নদীর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া যথায় দেহত্যাগ করিবেন সেইস্থানে সর্বসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় রাম স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্তুত সেই স্থানে দেবগণের সহিত আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোটি কোটি দিব্য বিমান। ...এই অবসরে পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, বিষ্ণো! স্বর্গে আগমন কর। তুমি আমাদেরই সৌভাগ্যে আসিতেছ।...তুমি অনুরূপ ভ্রাতৃগণের সহিত স্বশরীরে প্রবেশ কর। .. অনন্তর মহামতি রাম ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন। ...অনন্তর মহাতেজ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার অনুগামী এই সমস্ত ব্যক্তিকে যোগ্য লোক প্রদান কর। ইহারা স্নেহবলে আমার অনুগমন করিয়াছে। ইহারা ভক্ত, এই জন্যই আমার ভজণীয়। আমারই জন্য ইহারা দেহত্যাগ করিয়াছে। লোকগুরু ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! তোমার সহিত সমাগত এই সমস্ত লোক সন্তানক নামক লোকে গমন করিবে। ...বানর ও ভল্লুকগণ স্ব-স্ব দেবযোনিতে প্রবেশ করিবে। ...সুগ্রীব সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবেন। ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে যাহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে সরযূর গোপ্রতার তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা সরযূতে অবগাহন ও হৃষ্টমনে দেহ বিসর্জন পূর্বক বিমানে আরোহণ করিল। ঐ সরযূতে যে-সমস্ত পশুপক্ষী আসিয়াছিল তাহারাও ভাস্বর দেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। ...বানর ও রাক্ষসেরা সরযূতে দেহ বিসর্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিল এবং দিব্য দেহে দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ভগবান ব্রহ্মা সমাগত সকল ব্যক্তিকে এইরূপে স্বর্গ প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে দেবগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।'

[দশাধিকশততম সর্গ, বাল্মীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৯৪৫-৯৪৬]

বিরুদ্ধ ঐতিহাসিকদের আপত্তি গোপতরু-তীর্থস্থানটি নিয়েও। তাঁদের অভিমত হল, গোপ্রতার বা গোপতরু তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলিতে। তার আগের কোনো গ্রন্থে গোপতরু-তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাল্মীকি-রামায়ণের উপরিউক্ত উদ্ধৃতি ছাড়াও এই মহাগ্রন্থের অপর একটি প্রামাণ্য পাঠেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখি :

পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং স্বান্ পিতৄন্ প্রতিপেদিরে।
তথা ধ্রুবতি দেবেশে গোপ্রতারমুপাগতাঃ ॥' ২২

[ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ, উত্তরকাণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন, পৃ. ১৪৬৭]

(দেবদেব পিতামহ এই কথা বললে সকলেই আনন্দাশ্রু-পরিপূরিত লোচনে সরযূর সেই গোপ্রতার নামক মহাতীর্থে প্রবেশ করল)।

বিরুদ্ধবাদীগণের আরও বক্তব্য হল, শ্রীরামভক্ত তুলসীদাস অযোধ্যার সন্নিহিত অঞ্চলে বাস করেন, অথচ তাঁর লেখায় তো মন্দির-ধ্বংসের কোনো উল্লেখ নেই। উত্তরে বলি, শ্রীরামভক্ত তুলসীদাস একজন ভক্তিযোগী এবং কবি—ইতিহাস লেখক নন। শাশ্বতকালের কাহিনীতে সাময়িককালের স্থান অতি অল্প। আর তিনি লিখেছেন শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা, (যার সময়কাল অন্তত খ্রী.পূ. ৪০০০ বছর আগে) সেখানে খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতকের ঘটনার অবকাশ কোথায় ?

তথাপি তাঁর লেখায় বিদ্রোহ আছে। তিনি ধনুর্ধারী রামচন্দ্রকে পূজা করেছেন, হনুমানের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,

'সুনু দশকণ্ঠ কহউঁপন রোপী   বিমুখ রাম ত্রাতা নহিঁ কোপী।
সঙ্কর সহস বিষণু অজ তোহী   সকহিঁ ন রাখি রাম কর দ্রোহী॥

[সুন্দরকাণ্ড, গোস্বামী তুলসীদাস-রচিত রামায়ণ]

(অর্থাৎ, হে রাবণ ! আমি শপথ করে বলছি, রামবিমুখ পুরুষের রক্ষক কেউ নেই—সহস্র শঙ্কর, হরি ও ব্রহ্মাও রামের শত্রু তোমাকে রক্ষা করবেন না।)

কবির যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, বিদ্রোহের বাণী স্বভাবতই কাব্যিক হয়ে এখানে প্রকাশিত। মাইকেল মধুসূদন, বিষ্ণু দে অথবা জীবনানন্দ দাশ ঘটনার প্রত্যক্ষ উল্লেখ না করেও তাঁদের কবিতায় বিপ্লবের কথা বলেছেন। উচ্চকোটির কবিকুলের যথার্থ কৃত্য তুলসীদাস তাঁর কাব্যে অবশ্যই করেছেন, সোভন সংগত ভাবে।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব-সমীক্ষা-বিভাগ প্রাচীনকালের সরযূনদীর গতিপথ কেমন ছিল, তা দেখিয়েছেন। তাঁদের প্রকাশিত শীট নং ০৬৩ জে/ এন. ডবলুতে দেওয়া চিত্র অনুসারে অযোধ্যানগরীর উত্তরাংশ থেকে একখণ্ড চওড়া ভূ-ভাগ সাপের জিভের মত বেরিয়ে গেছে—যার তিনদিক বেষ্টন করে সরযূনদী বয়ে চলেছে (সয়োহয়ুং পহুগতে)। অতএব একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সরযূনদী পূর্ববাহিনী, অন্যদিক দিয়ে তা পশ্চিমবাহিনীও। সুতরাং ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা যাক, কোনো অমিল নেই।

প্রসঙ্গত বলা যায়, গঙ্গার গতিপথেও এমন দৃষ্টান্ত আছে। যেমন কলকাতার গঙ্গার কথাই ধরা যাক। খিদিরপুরের কাছে গঙ্গা একদিকে উত্তর থেকে দক্ষিণবাহিনী, অন্যদিকে পশ্চিম থেকে পূর্ববাহিনী। রেসকোর্স থেকে একজন মানুষ গঙ্গার পশ্চিমতীরেও আসতে পারে বাবুঘাটের গঙ্গায়, আবার উত্তর

তীরেও আসতে পারে খিদিরপুরের কাছে। গঙ্গাসাগরের মুখেও গঙ্গার এমন বিচিত্রগতি দেখা যায়। অবশ্য গঙ্গাসাগরের কথা পৃথক; কারণ, নদীর নিম্নগতিতে এই ধরনের অস্বাভাবিক গতি পরিবর্তন হয়েই থাকে।

দ্বিতীয়ত, অযোধ্যা মূলত বিন্ধ্যরেঞ্জের মধ্যে পড়ে। বিন্ধ্যপর্বত হিমালয়ের মতো পাললিক শিলাস্তর দ্বারা গঠিত নয়; আগ্নেয়শিলা দ্বারা গঠিত। আগ্নেয়-শিলার গঠনস্তরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংকোচন ও প্রসারণ। অতএব নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নয়।

সর্বোপরি রামায়ণোক্ত অযোধ্যা শুধু সরযূনদীর তীরেই অবস্থিত নয়। এই মহান নগরীর অন্যদিকে আছে তমসা নদী। আছে নন্দীগ্রামের বর্ণনা—যেখানে থেকে ভরত চৌদ্দ বছর রাজ্যশাসন করেছিলেন। রামায়ণে বর্ণিত শৃঙ্গেরপুরও অদ্যাবধি বর্তমান। গঙ্গাতীরস্থ এলাহাবাদের নিকট স্থান, যেখানে কেবট তিন যাত্রীকে নদী পার করান। প্রয়াগে ত্রিধারা-সঙ্গমে ভরদ্বাজের আশ্রম এখনও বিদ্যমান। এলাহাবাদে জহরলাল নেহরুর বাড়ীর পথেই তা বাঁ দিকে পড়ে। পূর্বকালের বর্ণনার সঙ্গে পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে, গঙ্গা এখন আশ্রমস্থল থেকে প্রায় মাইল-তিনেক দূরে সরে গেছে। মন্দাকিনী-তীরবর্তী চিত্রকূট আজও বিদ্যমান—যেখানে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কিছুদিন অবস্থান করেন।

৩

এখন এই অযোধ্যাকে শ্রীরামচন্দ্রের সেই অযোধ্যা বলার আগে ভূতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, সেই আমলের নন্দীগ্রাম, চিত্রকূট, শৃঙ্গেরপুর, প্রয়াগ—এগুলি এখন কোথায় ? সবই কি নদীগর্ভে অথবা বসুমাতার আঁচলে অন্তর্হিত ? এর উত্তর তাঁদের জানা নেই ! বলা বাহুল্য, তাঁদের এই অজ্ঞতা সজ্ঞানকৃত ; তাই চেতনাসঞ্চারও অসম্ভব।

উক্ত ঐতিহাসিকদের আরও অভিমত পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দী অযোধ্যায় যে শ্রীরাম-পূজার প্রচলন ছিল, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার উত্তরে কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপির উল্লেখ করি :

'কোনো এক বছরে কোনো এক মাসের দ্বাদশ দিনে, গৃহকর্তা ইন্দ্রঘোষ পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান রামনারায়ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন।' [শ্রীরামশিলা-স্মারিকা, বি. পি. শুক্ল, ১৯৮৮ এলাহাবাদ, পৃ. ৩২৪-২৫] উদ্ধৃত তথ্য থেকে এটুকু অন্তত বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়, প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্ব থেকেই নারায়ণ-রূপে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা শুরু হয়েছে।

যাই হোক, ইতিহাস পর্যালোচনাকালে পরবর্তী যুগের অযোধ্যার স্বরূপ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এ-পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ দ্বারা এটুকু প্রমাণিত যে, রামচন্দ্রের অযোধ্যা এবং আজকের অযোধ্যার অভিন্নতায় দ্বিমত-পোষণের কোন অবকাশ নেই। এখন প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাস্কর্য তথা চারুকলা-বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখা যাক, মসজিদ্-নামাঙ্কিত এলাকাটি শ্রীরামের মন্দির এবং তাঁর জন্মভূমি কি-না।

'আর্কিওলজি অফ্ রামায়ণ সাইটস্'-প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম খনন-কার্যের সময় মৃত্তিকার স্বাভাবিক স্তরে অত্যন্ত সুদৃশ্য কিছু মাটির বাসন পাওয়া যায়। এইসব বাসনের উপর সোনালি ও রুপালি রঙের ব্যবহার দেখা যায়। ভারতীয় শিল্পকলায় তার নাম, নর্দান ব্ল্যাক পালিশ ওয়ার। এক হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে পোড়ানো এইসব বাসন শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট মানেরই নয়, এগুলির আওয়াজ অনেকটা ধাতুর মতো। নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ও রেডিও-কার্বন পদ্ধতির সঙ্গে M.A.S.C.A সংশোধনী করে জানা গেছে, এগুলি খ্রী.পূ. অষ্টম-নবম শতাব্দীরও আগে নির্মিত। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগের কথা।

জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অযোধ্যায় প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য শুরু হয় ১৯৭৫-৮০ সালে। কিন্তু তার পূর্বে ১৯৬৯-৭০ সালে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ এ. কে. নারায় স্বতন্ত্রভাবে এখানে তিনটি খনন-কার্য পরিচালনা করেন। তৎপরেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ নুরুল হাসান-এর নেতৃত্বে বিশাল একটি জাতীয় পরিকল্পনা করা হয়। উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানের হারানো-কোষ্ঠী উদ্ধার করা। তখন মোট তিনটি স্থানকে এই গবেষণা-কার্যের জন্য নির্বাচিত করা হয়। তার মধ্যে প্রথম রামায়ণ-সম্পর্কিত স্থানগুলির খনন। দ্বিতীয়টি হল ফতেপুর-সিক্রির পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার। তৃতীয়টি, হাম্পীর খননকার্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রথমটি।

'আর্কিওলজি অব্ রামায়ণ সাইট্স্'-নামের এই গুরুতর কার্যের ভার দেওয়া হয় তৎকালীন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর-জেনারেল ডঃ ব্রজবাসীলাল বা সংক্ষেপে বি. বি. লালের উপর। ডঃ লাল শুধুমাত্র ভারতবর্ষেরই নয় সমগ্র বিশ্বের প্রথম সারির দশজন পুরাতত্ত্ববিদগণের অন্যতম। যাই হোক, ডঃ লালের নির্দেশে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-দপ্তরের জরিপ-বিভাগের সহযোগিতায় এই খননকার্য শুরু হয়। অযোধ্যায় এজন্য মোট ১৪টি স্থান নির্বাচিত হয়। তার মধ্যে চারটি স্থান রাম-জন্মভূমি-সংক্রান্ত।

এলাহাবাদ মিউজিয়মের তৎকালীন ডিরেক্টর ডঃ স্বরাজপ্রসাদ গুপ্ত বা এস. পি. গুপ্ত এই খননকার্যের সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য থেকেই জানা যায়, রাম-জন্মভূমির অনুসন্ধানে ঠিক কোন চারটি জায়গায় খনন চালানো হয়।

'Since I am an Archaeolog·st who was for sometime connected with the research work done at the site, I will like to place here some facts within the frame-work of my specialisation. The team laid four trenches—two exactly at the back of the Mosque on the western side and two along the southern wall of the Mosque. [Hindu Chetana, Vol I, No. 4, p. 7]

পশ্চিমদিকে মসজিদের ঠিক পিছনেই দুটি গর্ত খোলা হয়, আর দক্ষিণদিকে দুটি। এই দক্ষিণদিকের একটি জায়গা মন্দিরের দরজার সন্নিকট। আধ-মিটারখানেক খোঁড়া হতেই উঠতে আরম্ভ করে নানারকম উৎসাহব্যঞ্জক নিদর্শন, যার দ্বারা সুনিশ্চিতভাবেই প্রমাণ হয়ে যেত : রাম-জন্মভূমির নিচে কতকালের কত ঐতিহাসিক তথ্য আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শেষ করা দূরে থাক, তার শুরুই করতে দেওয়া হল না।

এ কাজের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডঃ লাল তাই দুঃখ করে বলেন, 'Obviously many more will be found existing if we are allowed to dig below the Mosque.'

তবু এই সামান্য খনন-কার্যের মাধ্যমে যতটুকু পাওয়া গেছে, তাতে শ্রীরামচন্দ্রের আবাসগৃহ কেমন ছিল তা জানা না গেলেও, এইটুকু অন্তত সুনিশ্চিত হওয়া গেল যে, বিতর্কিত সৌধটি মসজিদ তো নয়ই—শত-সহস্রবার মন্দির এবং সে-মন্দিরের বয়স মসজিদ অপেক্ষা কম করেও ৪০০ বছর বেশি (যদিও এ ব্যাপারেও আমরা একমত নই।) এখন দেখা যাক, এই সামান্য খননকার্যেব ফলে কী-কী অমূল্য সম্পদ পাওয়া গেছে।

(১) এই স্বল্প খননের ফলেই পাওয়া গেছে বিভিন্ন সময়ের কিছু ইঁট। যাতে বোঝা গেছে খ্রী.পূ. দশম থেকে অষ্টম শতাব্দীর বহু মানুষ এই ভূমিখণ্ডের উপর ক্রমান্বয়ে ঘর বেঁধেছে। এই ইঁটগুলি থেকে সেই ভাঙাগড়ার ধারাবাহিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মাটির বাসনের কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে।

(২) খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভূস্তর কেটে সেই ভূমিতে কিছু স্তম্ভ পাকা ভিতের উপর তৈরি হয়।

(৩) পাকা ইঁটের স্তম্ভগুলির উপরে বহু শতাব্দী পূর্বের চুণের আস্তরণের অবশেষ পাওয়া গেছে।

(৪) রাম-জন্মভূমির উপর অবস্থিত বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত সৌধটিতে যে ১৪টি কোষ্টি-পাথরের স্তম্ভ রয়েছে, সেই স্তম্ভগুলির মাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়, জন্মভূমি-নামাঙ্কিত পাকা ভিতের উপর প্রোথিত স্তম্ভগুলি একই প্রকার।

(৫) এই আধার-স্তম্ভগুলি একটি বিশেষ দিগাভিমুখে বসানো আছে। যদি খনন কার্য বিস্তৃত হয় তাহলে ঐ বিশেষ দিকের অভিমুখে আরও আধার-স্তম্ভ পাওয়া যাবে। কারণ ভগ্নাবশেষের মুখ খোদিত ট্রেঞ্চের মধ্যে দিয়ে

দরজাভিমুখে গেছে—যা থেকে বোঝা যায়, সামনে গিয়ে এই ভগ্নাবশেষ দুপাশে আরও বিস্তৃত।

এই-প্রসঙ্গে এলাহাবাদ মিউজিয়মের তৎকালীন ডিরেক্টর এস. পি. গুপ্ত বলেন, 'এমন কি, এখনও যদি আরও খনন করা হয়, তবে স্তম্ভগুলির একেবারে নিচে ইটের ভিত্তি এবং চুনে তৈরি-করা মেঝে সারা বিশ্ববাসীর নিকট উন্মোচিত হয়ে যাবে।' [রামজন্মভূমি-বিতর্ক : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব কি বলে ?]

ডঃ গুপ্ত মনে করেন, 'আরও খনন করলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আরও ইটের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগুলি দেখতে পাবেন। বিশাল মন্দিরের এলাকা তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই সব স্তম্ভের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল।' তিনি বলেন, 'পরবর্তীকালে মন্দিরের অনেকগুলি স্তম্ভকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, সম্ভবত চুণের সঙ্গে মিশিয়ে মসজিদ তৈরি করার উদ্দেশ্যে।' [তদেব]

পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্যকেই একমাত্র সাক্ষ্য বলে মনে করার কারণ নেই, সাক্ষ্য আরও আছে। তা হল, ভাস্কর্যশিল্প এবং স্থাপত্যকলা-বিজ্ঞান। এখন সেই আলোকে বিচার করে দেখা যাক, ১৫২৮ খ্রীঃ নির্মিত বাবরি মসজিদ নামে খ্যাত, (এবং বাবরেরও অন্তত ৪০০ বছর আগেকার শিল্প সম্ভারে সজ্জিত) দণ্ডায়মান সৌধটি মন্দির না মসজিদ !

(১) উপরে যে ১৪ টি কালো কোষ্টিপাথরের স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে সেগুলির গাত্রে খোদিত আছে নানান সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম : পূর্ণ কলস, কলসগাত্রে নানাধরণের সুদৃশ্য পুষ্পিত লতাসহ বৃক্ষশোভিত চিত্র—তার ভিতরে রয়েছে নয়নমনোরম প্রস্ফুটিত পদ্ম, বিভিন্ন দেবদেবী, পরী, দ্বারপাল-প্রভৃতির মূর্তি। বলা বাহুল্য, উক্ত খোদিত মূর্তিগুলির অধিকাংশই অঙ্গহীন।

(২) মূর্তিগুলি দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫-২০ সেন্টিমিটার। স্তম্ভগুলির উপর অংশ অষ্টভুজাকৃতি হলেও ভিত্তির দিকে সেগুলি বর্গাকারেই নির্মিত।

(৩) মসজিদের অঙ্গন-চত্বরে দেওয়াল-সংলগ্ন একটি চৌকাঠ রয়েছে। স্তম্ভগুলির মতো সেই দ্বার-শাখাটিও একই কালো কোষ্টিপাথরের তৈরি। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত দ্বারশাখাটি নানা সূক্ষ্ম শিল্পকর্মে মণ্ডিত। এটির দৈর্ঘ্য ১১৫ সেন্টিমিটার।

(৪) ঐ চৌকাঠটির উপরভিতের কাছে একটি কুলুঙ্গি। তার উপর পাগড়ি মাথায় এক দ্বারপাল দণ্ডায়মান, তার কণ্ঠে মাল্য, কিন্তু গাত্র নগ্ন। কুলুঙ্গির উপর দিকে বিভিন্ন লতাপাতার নানান কারুকার্য। সুসজ্জিতা পাঁচটি

দেবকন্যা বা অপ্সরা একটি পুষ্পিত শাখাকে অবনমিত করে রেখেছে। উপরের মূর্তিটি সালভঞ্জিকার।

এই গেল ভাস্কর্য-শিল্পের প্রধান-প্রধান উদাহরণ। চিহ্ন আরও আছে—তার সব-কিছুই এই স্বল্প-পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক, উপরে শিল্পকলা সম্পর্কে যতটুকু বলা হয়েছে সেটুকুই তার সময়কাল নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

এখন দেখা যাক, এই শিল্পরীতি-বিশ্লেষণে কি পাওয়া যায়। শিল্পরচনা শৈলী-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে, উপরিউক্ত বিভিন্ন ভাস্কর্যের সাজসজ্জা—যেমন লতা-পাতার কারুকাজ, ফুলের সাজসজ্জা, বনমালা, নারীমূর্তির দৈহিক গঠন অর্থাৎ চোখ-মুখ-নাক-কান, দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা, এবং অন্যদিকে তোরণের আকৃতি, পলেস্তরা-প্রভৃতি সযত্নে নিরীক্ষণ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, উক্ত স্তম্ভগুলির ভাস্কর্যশিল্প একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর শিল্প-কলারই স্বাক্ষর বহন করে। অর্থাৎ এই মসজিদ-নামাঙ্কিত মন্দিরটির নির্মাণকাল এখন থেকে প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন। শিল্পকলার ইতিহাসে এগুলিকে লেট প্রতিহার বা গাড়োয়াল-শিল্পরীতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ শিল্পশৈলীর সমাবেশ দেখা যায় কনৌজের গাড়োয়াল-রাজাদের দ্বারা সংস্থাপিত মন্দিরগুলিতে। সময়ের হিসাবে সেগুলিও খ্রীষ্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর।

উল্লিখিত শিল্পরীতি, ভাস্কর্য এবং পুরাতাত্ত্বিক যে-সমস্ত নিশ্চিত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেল, তাতে স্বাভাবিকভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন জাগে: ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাবর যদি এই মসজিদ নির্মাণ করিয়ে থাকেন এবং মীরবাঁকি-নামে তাঁর সেনাপতি সেই যজ্ঞের পুরোহিত, তাহলে প্রত্নতত্ত্ব ও ভাস্কর্যশিল্পের বিচারে সেই বিতর্কিত সৌধটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর হয় কি করে?

দ্বিতীয়ত, পুরাতত্ত্ব ও স্থাপত্যকলার মতকে স্বীকার করলে, এটিও স্বীকার করতে হবে, মসজিদ-নামাঙ্কিত সৌধটির নির্মাণকার্য অবশ্যই একাদশ-দ্বাদশ শতকে সম্পন্ন হয়েছিল। আরও লক্ষণীয়, সেই সৌধগাত্রে-সংলগ্ন লিপিতে উৎকীর্ণ আছে 'সীতাপাক'-নামের একটি শব্দ এবং আরও উল্লেখ আছে: মীরবাঁকি নামে এক ব্যক্তি ৯৩৫ হিজরিতে (১৫২৮ খ্রী) এই মসজিদ নির্মাণ করান। কিন্তু হিজরি-অব্দের উৎপত্তির বিচারে তা সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। 'কোরেশদের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য হজরৎ মহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই, সন্ধ্যায় যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান, সেদিন থেকেই এই অব্দের শুরু হয়।' [আদিযুগ, গৌড়-কাহিনী, পৃ. ৯৪]

—অর্থাৎ ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে হিজরি সন হয় ১৫২৮-৬২২=৯০৬ বা হিজরি অব্দ। এক্ষেত্রে লেখা আছে ৯৩৫ অর্থাৎ ২৯ বছরের ব্যবধান। তখন ইংরেজি সাল হয় ১৫২৮-২৯ অর্থাৎ ১৫৫৭-৫৮ খ্রী.। সময়টা বাবরের নয়, আকবরের। আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাহলে ঐ 'সীতাপাক' এবং অন্যান্য ফলক লাগানোর কাজটা কি আকবরেব আমলে সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু তাই বা বলি কি করে? আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক Dr. Harsh Narain প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রয়াত সৈয়দ শাহাবুদ্দিন আবদুর রহমানের একটি বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন একটি লেখায়, এখানে তার অংশবিশেষ উল্লেখ করি: 'According to old records, it has been a rule with the Muslim rulers from the first to build Mosque, Monasteries, and inns, spread Islam and put (a stop to) non-Islamic practices, wherever they found prominence (of kubr). Accordingly, even as they eleard up, Mathura, Brindavan, etc. from the rubbish of non-Islamic practices, the Babri Mosque was built up in 923 (?) A. H.'

আবার ইসলামের জগতের একজন তর্কাতিত পণ্ডিত মৌলানা হাকিম সৈয়দ আবদুল হাই, তাঁর 'হিন্দুস্তান ইসলামী আহাদ মে' গ্রন্থে অযোধ্যা সম্পর্কে লিখেছেন, '…সীতা যেখানে থাকতেন…ঠিক ঐ স্থানেই বাবর ৯৩৬ হিজরিতে মসজিদ নির্মাণ করেন।' ইংরাজী সাল অনুসারে তা ১৫৫৮-৫৯ খ্রী.।

দেখা যাচ্ছে, এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখে নেই। কোথাও ৯৩৫ হিজরি, কোথাও ৯২৩, আবার কারো মতে ৯৩৬। অথচ নায়ক সেই একই মীরবাকি। ব্যাপারটা কি? ১৫২৮ খ্রী. বাবরের নির্দেশে মসজিদ নির্মাণ করা হলে সেটা হবে ৯০৬ হিজরি। যাই হোক, ইতিহাস আলোচনাকালে সন-তারিখের হিসাব মেলানো যাবে। আপাতত বাকি প্রশ্নগুলি দেখা যাক।

দেখা যাচ্ছে, মীরবাকি নামে একজন সেনাধ্যক্ষ ঐ মসজিদ নির্মাণ করেন। অথচ পুরাতত্ত্বের মতে মসজিদের আদলে মন্দিরটির বয়স কমপক্ষে আট-নয়শত বছর। মন্দিরের একটা living structure এর উপর ওইরকম তিনটি গম্বুজ নির্মাণ করা সম্ভব। তাতে বলপূর্বক দখল-কায়েমের চেষ্টাই প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, বিতর্কিত সৌধটির প্রাচীরের গাত্র-সংলগ্ন একটি নিম-পিপল গাছের মূলদেশে রয়েছে অতিপ্রাচীন ভগ্ন একটি বরাহমূর্তি। মাটির তৈরি

মূর্তিটির গাত্রে অঙ্কিত কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন থেকে মনে হয় : তাতে অঙ্কিত ছিল বিষ্ণুর অবয়ব। হিন্দু-ধর্মানুসারে এ অনুমান অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত—কারণ, বরাহ হলেন বিষ্ণুর দশ-অবতারের তৃতীয়-রূপ।

তৃতীয়ত, মসজিদ-নামে অভিহিত সৌধটি আদৌ যদি মসজিদই হবে, তবে তার অভ্যন্তরে স্তম্ভগুলির গাত্রে নানা দেবদেবীর মূর্তি ও পুষ্পিত লতাপাতায় চিত্রিত এত শিল্পের বিপুলতা কী ভাবে সম্ভব ? ইসলাম-ধর্মানুসারে মসজিদের অভ্যন্তরে তথা দেওয়ালগাত্রে কোনো চিত্র থাকে না। একথা সবাই জানেন, ইসলামের উপাস্য আল্লার কোনো মূর্তি নেই। অন্যদিকে মসজিদের অভ্যন্তরে মূর্তিপূজার ভূরি-ভূরি প্রমাণ রয়েছে। বিশেষ করে রামসীতার খোদাই করা মূর্তি ও দশাবতারের মূর্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি মসজিদের ভিতর জন্মভূমির বেদী স্থাপিত হয় কি করে ? এ ব্যাপারে আইন-বিশারদ মাননীয় গণপতি আয়ার বলেন, 'After the first half century from the flight there is no Mosque without a Minaret'। বেইলি তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'When an assembly of worshippers pray in a Masjid with permission, that is delivery. But it is a condition that the prayers be with Azan, or the regular call, and be public and not private, for though there should be an assembly yet if it is without azan, and the prayers are private instead of public, the place in no Masjid'. [The law relating to Hindu and Mohamedan Endowments. 2nd Edition, 1918, Chapter XVII, p. 388-90.]—অর্থাৎ একটি মসজিদ তৈরি করতে হলে, মিনার তার একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ। কারণ, মুয়াজ্জিম উপাসনার জন্য আহ্বান করেন, যাকে 'আজান' বলা হয়—এটি করা হয় মিনারের উপরিস্থিত বারান্দা থেকে। বেইলি এর বিস্তৃত কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'যখন একটি মসজিদে সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেটা হয় বক্তৃতা। কিন্তু এটি সর্তসাপেক্ষ যে, প্রার্থনার সঙ্গে থাকবে "আজান" বা নিয়মিত আহ্বান। এটি হবে প্রকাশ্যে এবং উন্মুক্তভাবে, গোপনে নয়। যদিও আজান ছাড়াও সমাবেশ হতে পারে এবং প্রার্থনা সকলের জন্য না হয়ে ব্যক্তিগত হতে পারে—তবে সেই স্থানকে মসজিদ বলা যাবে না।'

চতুর্থত, মসজিদের চারপাশে প্রদক্ষিণের কোনো জায়গা রাখার দরকার

নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। গুরু ও ইষ্টকে প্রদক্ষিণ হিন্দু সাধকদের সাধনার গোপন তত্ত্বের পর্যায়ভূত।

পঞ্চমত, মসজিদ হলে তার সংলগ্ন স্থানে অবশ্যই একটি জলাধার থাকতে হবে। এখানে তা নেই। এক্ষেত্রে অবশ্য আরও একটা কথা উঠতে পারে যে, সব মসজিদের পাশে পুকুর বা জলাশয় নেই। যেমন কলকাতা বা যে কোনো মেট্রোপলিটন শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মসজিদে পুকুর নেই। যেমন ধর্মতলা বা হেষ্টিংসের মসজিদের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সেখানে জলের স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। অযোধ্যায় মসজিদ-সংলগ্ন স্থানে তেমন কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়ে না। সর্বোপরি আযাধ্যায় বিতর্কিত মসজিদ যে সময়ের তখন কলের চল ছিল না। অতএব এক্ষেত্রে পুষ্করিণী বা কূপ থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। না তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই, নেই আজানের জায়গাও।

ষষ্ঠত, মসজিদে কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অযোধ্যার জন্মভূমি-চত্বরে ঢুকতেই দরজা, ও তার চৌকাঠটি চন্দনকাঠের তৈরি।

সপ্তমত, মন্দির সংলগ্ন স্থানে মৃত্তিকা-নির্মিত প্রাচীন বরাহের মূর্তি রয়েছে। ইসলামের ভাষায় যাকে বলে 'হারাম' সেখানে তো মসজিদ হতেই পারে না।

তাহলে এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করতে হয়, যে বাবর এই মসজিদ তৈরি করিয়েছিলেন, তিনি কি পৌত্তলিক ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন? এবং তাঁর অনুবর্তী মীরবাঁকিও? নাকি ভারতীয় শিল্পকলার আকর্ষণে মন্দিরের আদলে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন? কিন্তু তাহলেও অন্তরঙ্গে মন্দির বহিরঙ্গে মসজিদ কেন?

যাঁর হাত দিয়ে এই পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যের আরম্ভ হয়েছিল, তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ নুরুল হাসান। এ বিষয়ে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন এই বলে, 'একটি মসজিদে কোন মূর্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এর স্তম্ভের গায়ে মূর্তি রয়েছে। মসজিদে অবশ্যই একটি মিনার থাকে, কুয়ো থাকে; কিন্তু এখানে সে-রকমটি নেই। এর স্তম্ভগাত্রে খোদিত লক্ষ্মণ, গণেশ ও হনুমানের মূর্তি প্রমাণ করে, নিশ্চয়ই এই মসজিদ ঐ স্থানের মন্দির বিনষ্ট করে নির্মিত হয়েছিল।' [অযোধ্যায় শ্রীরাম আর কতদিন অপমান সইবেন?, গুমনমল লোধা, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, গৌহাটি হাইকোর্ট, পৃ. ৯]

অথচ তিনি তো খননকার্যের সূত্রপাত হতে-না-হতেই সে প্রকল্পকে বন্ধ করে দিলেন কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে? যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কারণ

এ-বিষয়ে দেখানো হয় নি। বরং বলা যায়, আসল তথ্য প্রকাশিত হবার আশঙ্কাতেই তা করা হয়।

দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি অবলোকন করেও দেশনেতাগণ স্বীকার করতে পারছেন না। তা সত্ত্বেও শিয়া-সম্প্রদায়ের সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা তাঁদের ভাষাতেই পরিবেশন করছি: 'আমরা যখন ঐ ইমারতের দিকে তাকাই তখন কি দেখি? উপর থেকে মসজিদ ভিতরে মন্দির। ১৬ টি স্তম্ভের উপর দিবদেবীর চিত্রাঙ্কিত, জমিতে হিন্দুদের চিহ্ন, দরজাতেও হিন্দু-চিত্র। এই যার নমুনা, সত্যের প্রতি যাঁর সামান্য আস্থা আছে তিনি কি তাকে মসজিদ বলবেন? দেবদেবী-চিত্রাঙ্কিত-স্তম্ভবেষ্টিত স্থানে কি নামাজ পড়া বৈধ? এটা মসজিদ নয় মন্দির।' [খোমেইনী আরবী, দারুল উলম, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত দৈনিক, ২০ মে, ১৯৮৮]

মৌলানা শেখ শবীহুল হাসান নাজির পুরা (বহরাইচ) স্বতন্ত্র ভারতের ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ সংখ্যায় এই ভবনকে মন্দির বলে স্বীকার করেছেন।

লক্ষ্ণৌ-এর ভূতপূর্ব ট্রাষ্টি ডঃ হুজুর নবাব ১৯৮৫ সালের ২৪ এপ্রিল শ্রীদাউদয়াল খান্নার নিকট এক পত্রে লেখেন, 'আমি মনে করি, অযোধ্যা, মথুরা, বারাণসী ও লক্ষ্মণপুরী লখনৌ এগুলি সবই প্রথমে মন্দির ছিল, পরে অন্য কোনো শক্তি এসে মসজিদ তৈরি করেছে। মুসলিমদের সেগুলি নিজের থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।' [তদেব]

যাঁর রচনা থেকে পূর্বে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁর আর-একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করি: It is also thinkable that some Mosque was erected close to or at a short distance from a temple demolished for some special reason, but never was a Mosque built on the site of a temple anywhere. [Babri Masjid, 3rd print, Azamgarh : Darul Musannifin Shibli Academy, 1987, p. 19.]

এই প্রসঙ্গে আরও দুটি পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরাতত্ত্ব-বিভাগের জয়েণ্ট ডিরেক্টর ডঃ কে. বি. সুন্দররাজন (যিনি আর্কিওলজি অব রামায়ণ-সাইটস্-এর প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন)-প্রদত্ত রিপোর্ট এইরূপ: 'মীর বাঁকি অযোধ্যায় রামমন্দিরের স্থানটির ঠিক উপরেই মসজিদ নির্মাণ করেন।' [সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, ১৯৮৯, ১০ম অধ্যায়]

'অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের হিন্দু-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যগুলি মসজিদ-

নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীরামের জন্ম ও লালনপালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানটির উপরই একটি মসজিদ তৈরি হয়। হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র রামজন্মভূমির অবশেষাদি এর কাছেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।' [কোর্ট-অব-ইণ্ডিয়া প্রকাশিত হিন্দু এনডাউমেণ্ট কমিশন-রিপোর্ট, লেখক ডঃ সি. পি. রামস্বামী আয়ার, পৃ. ১৬৬]

এ-পর্যন্ত যা আলোচনা করা হল তা সংক্ষেপে এই: ১৯৫৯-৭০ সালে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এ. কে. নারায়ণ অযোধ্যায় তিন জায়গায় খননকার্য চালান। তৎপরে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালে ডঃ নুরুল হাসানের নেতৃত্বে, ডঃ বি. বি. লালের পরিচালনায় অযোধ্যায় দ্বিতীয়বার খনন-কার্যটি হয়। এই সময় মোট ১৪টি জায়গায় খনন চলে। দুটি পর্যায়ে মোট ১৪+৩=১৭টি জায়গায় পুরাতাত্ত্বিক খনন চালানো হয়। এই বিশাল অনুসন্ধান কর্মে যে-সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে পুরাতত্ত্ববিদ ও গবেষকগণ একমত যে: রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা এবং আজকের অযোধ্যা একই। মসজিদ-বিতর্কের বহু পূর্ব থেকেই ঐ স্থানে রামের মন্দির ছিল এবং বর্তমান সৌধটিও সেই বিশাল মন্দিরের অংশবিশেষ। মীর বাঁকি বাবরের নির্দেশে সেই মন্দির দখল করেন এবং তারই উপাদান দিয়ে মন্দিরের উপরে তিনটি মিনার বা গম্বুজ তৈরি করান। বর্তমানে মসজিদ-নামে পরিচিত সৌধটির বয়স সেটি নির্মাণের কথিত সময়কাল থেকে অন্ততঃ ৪০০ বছরের বেশি। অযোধ্যা প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতি-সম্পন্ন শহর। বহু ভাঙাগড়ার সাক্ষ্যবহনকারী এবং অন্তত ৪০০০ বছরেরও বেশি পুরনো।

যাই হোক, এ-পর্যন্ত যে সব পুরাতাত্ত্বিক রিপোর্ট ও মতামত তুলে ধরা হয়েছে তাতে অন্তত এটুকু প্রতীত হবে যে, কোনো-এক গোপন কারণেই দিনের আলোর মতো প্রকাশ্য সত্যটিকে সজ্ঞানে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

৪

এবার প্রত্নতত্ত্বের অঙ্গন থেকে ইতিহাসের দিকে তাকানো যেতে পারে। পুরাতত্ত্বের অভিমত তো মন্দিরের দিকেই। ইতিহাসের আলোচনার প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, এ-বিষয়ে আমরা তিনটি বিষয়ের সাহায্য নেব। প্রথমটি হল শ্রুতি ; অর্থাৎ যা বংশ-পরম্পরায় চলে আসছে সেইসব লোকশ্রুতি। দ্বিতীয় স্মৃতি, অর্থাৎ পূর্বাপরকাল বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী এবং সাধক-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের স্মৃতি-বাহিত কথা। তৃতীয়টি হল, লিখিত যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে। সময়ের দিক থেকেও বিষয়টিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। কেউ-কেউ হয়তো আপত্তি তুলতে পারেন, শ্রুতি এবং স্মৃতি আর যাই হোক ইতিহাস নয়। তৎসত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, শ্রুতি এবং স্মৃতিই হচ্ছে ইতিহাসের মূল উপাদান। ইতিহাস না হোক, ইতিহাস লেখার রসদ যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা শ্রুতি এবং স্মৃতি। ভারতবর্ষের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ সমস্ত-কিছুই একদা শ্রুতি এবং স্মৃতি-নির্ভরই ছিল। বেদের অপর নাম যে শ্রুতি তা এই কারণে। বিশ্বের যে কোনো প্রাচীন ইতিহাস রচনার মূলে রয়েছে শ্রুতি এবং স্মৃতি। ডঃ ক্যানিংহাম. এস. এলিয়টও উক্ত বিষয়ে একমত। হ্যান্স বেকারও এই পদ্ধতির অবলম্বনেই তাঁর 'অযোধ্যা'-নামের বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত এই :

'ইতিহাস লোকের মুখে-মুখে জনশ্রুতি-আকারে ছড়াইয়া থাকে ; ঐতিহাসিকের প্রতিভা তাহাদিগকে একটি সূত্রের চারিদিকে বাঁধিয়া তুলিবামাত্র এত কালের অব্যক্ত ইতিহাসের ব্যক্তমূর্তি আমাদের কাছে ধরা দেয়।...

'যে-সময়ে লেখা পুঁথি এবং ছাপা বইয়ের চলন ছিল না এবং যখন গায়কেরা কাব্য গান করিয়া শুনাইয়া বেড়াইত তখন যে ক্রমে নানাকালে ও নানা হাতে একটা কাব্য ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্যের কথা নাই।

'প্রথমে নানা মুখে প্রচলিত খণ্ডগানগুলা একটা কাব্যে বাঁধা পড়িয়া সেই কাব্য আবার যখন বহুকাল ধরিয়া সর্বসাধারণের কাছে গাওয়া হইতে থাকে, তখন আবার তাহার উপরে নানাদিক হইতে নানা কালের হাত পড়িতে থাকে।

সেই কাব্য দেশের সকল দিক হইতেই আপনার পুষ্টি আপনি টানিয়া লয়। এমনি করিয়া ক্রমশই তাহা সমস্ত দেশের জিনিস হইয়া উঠে।…

'এইরূপ কালে-কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।··

'তেমনি মহাকাব্যও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র আছে। ইলিয়ড অডেসি রামায়ণ ও মহাভারত।…

'রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে সেইরূপ একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল। তিনি যে পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীহরণকারীকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রমাণ করে বটে, কিন্তু যে অসাধারণ লোকহিত সাধন করিয়া তিনি লোকের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিলেন রামায়ণে কেবল তাহার আভাস আছে মাত্র।' [সাহিত্যসৃষ্টি, সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃ. ৭৮৫-৮৮]

বিতর্কিত মন্দিরটির প্রসঙ্গে দুটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথমটি হল। রাজা বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে এই মন্দির নির্মাণ করান এবং শুধু রামমন্দিরই নয়, রামচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলিতে মোট ৩৬০টি মন্দির নির্মাণ করেন। এর মধ্যে তাঁর বিশাল কীর্তি রামজন্মভূমির উপর নির্মিত এক মন্দির। সিংহাসনে আরোহণের পর বিক্রমাদিত্য অন্যান্য গঠনমূলক কাজের মধ্যে প্রাচীন তীর্থস্থানগুলির সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দেন। অতঃপর তিনি রামায়ণের উল্লিখিত রামচন্দ্রের জন্মস্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁর কুলপুরোহিতের নিকট অবগত হন যে, বিরাট অযোধ্যাভূমির মধ্যে বিচরণকালে যেখানে কামধেনু গাভী গিয়ে স্থির হবে, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুগ্ধবর্ষণ করবে, সেখানেই জানতে হবে রামের জন্মস্থান। এইটুকুমাত্র সংকেত জেনে বিচক্ষণ রাজা শ্রীরামের জন্মস্থান নির্ণয় বহির্গত হন।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তিনি প্রয়াগ থেকে অগ্রসর হলেন সরযূ নদীর দিকে। সরযূ ও সয়ী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সমগ্র এলাকাটি গহন অরণ্যে আবৃত এবং বন্য জীবজন্তুতে পূর্ণ—দিবাভাগেই চলা দুষ্কর। কিন্তু তিনি অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে স্বেচ্ছা-বিচরণশীলা কামধেনুর পশ্চাতে চললেন। অবশেষে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে ধেনু স্বেচ্ছায় দুগ্ধবর্ষণ

করে। শুরু হয়ে গেল খননকার্য। সত্য-সত্যই পাওয়ার গেল শ্রীরামচন্দ্রের বিশাল সেই রাজপুরীর সন্ধান। ক্রমে খননের ফলে পাওয়া গেল দশরথের চার পুত্রের এবং হনুমানের মূর্তি। পাওয়া গেল কোষ্টিপাথরে নির্মিত ৮৪টি স্তম্ভ, যার গায়ে শ্রীরামচন্দ্রের পরিবারের অনেকেরই মূর্তি খোদিত। নৃপতি নিশ্চিত হলেন : সেটি রামচন্দ্রেরই রাজপুরী।

অতঃপর বিক্রমাদিত্য সেখানে গড়ে তুললেন এক মন্দির। সপ্তশিখর-সমন্বিত প্রায় নবতল-উচ্চতা-বিশিষ্ট নানা শিল্পশোভার সারই সেই মন্দিরটি হল একটি বিস্ময়কর দর্শনীয় পুরাকীর্তি। সেই মন্দির নির্মাণে ব্যবহৃত হল খননকার্যের সময় প্রাপ্ত ৮৪টি স্তম্ভ। তৎপরে সেই মন্দির উন্মুক্ত হল দেশের সর্বসাধারণের জন্য। এইভাবে রামের জন্মস্থানে রামরূপী নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা হল।

দ্বিতীয় কিংবদন্তীটি এই। রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণের পরে দিগ্বিজয়ে নির্গত হন এবং মহাদেবের কৃপায় সপ্তদ্বীপ-ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বররূপে খ্যাতি লাভ করলেন। এই বিচক্ষণ নৃপতিকে তাঁর প্রজাকুল রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করত। অযোধ্যানগরী আবিষ্কার করে বিক্রমাদিত্য সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। রামচন্দ্রের জন্মস্থান নির্ণয় ও মন্দির নির্মাণকার্য তাঁর আমলেই হয়েছিল। মন্দিরের বর্ণনা-ইত্যাদি পূর্বানুরূপ।

সাধু-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত স্মৃতি অনুযায়ী রাজা বিক্রমাদিত্য মন্দির তৈরি করেন নি। যুধিষ্ঠিরের আমলের বহু পূর্বকাল থেকেই ওখানে রামচন্দ্রের মন্দির ছিল। ভারতযুদ্ধের পর দেশ বীরহীন এবং নৃপতি-বিহীন হয়ে থাকলে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি সমগ্রভাবেই অবলুপ্ত হতে থাকে। রাজা পরীক্ষিতের পরে প্রায় সমস্ত লোপ পেয়ে যায়। পরীক্ষিতের দীর্ঘ সময় পরে নৃপতি বিক্রমাদিত্য সেই জন্মস্থান খনন করে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার এবং সেটি পুনর্নির্মাণ করেন। তারপরেও সেই মন্দিরে বহু ভাঙাগড়া হয়েছে, কিন্তু আসল-চিহ্ন লোপ করতে কেউই পারেন নি। স্তম্ভের গায়ে যে শিল্পকীর্তি, সেগুলি রামচন্দ্রের ধ্যানের চিত্ররূপ বা ব্যাখ্যা।

এবার দেখা যায়, ঐতিহাসিক তথ্য এ-বিষয়ে কি বলে ? ঐতিহাসিকগণের মতে, রাজা বিক্রমাদিত্য একজন নন, দু-জন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের সবিশেষ পরিচয় জানা যায় না। শুধুমাত্র এইটুকুই জানা যায় যে, শকগণ উত্তরপশ্চিম ভারত থেকে অগ্রসর হয়ে, অন্ধ্র-সামন্ত গর্দভিলার কাছ থেকে মালব অধিকার করে উজ্জয়িনীতে এক শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। নিহত

গর্দভিল্লার পুত্র অন্ধ্র-রাজধানীতে ফিরে যান। এবং সেখান থেকে শক্তি-সংগ্রহ করে ফিরে এসে, শকদের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করায় শোচনীয় ভাবে পরাজিত শকেরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। অন্ধ্র-সামন্ত গর্দভিল্লার অজ্ঞাতনামা পুত্রের সুনিপুণ রণনীতির ফলেই তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্য ঘটে। তারই সুযোগ্য পুরস্কার হিসাবে অন্ধ্র-সম্রাট সাতবাহন, গর্দভিল্লার পুত্রকে বিক্রমাদিত্য-উপাধিতে ভূষিত করে মালবের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর তাঁরই দিগ্বিজয় স্মরণীয় করে রাখতে খ্রী· পূ ৫৭ অব্দে বিক্রম-সংবতের সূচনা করা হয়। [আদিযুগ, গৌড়-কাহিনী, শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, পৃ· ৭০]

অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ২০৫০ বৎসর পূর্বে রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের বয়স অন্তত দু-হাজার বৎসর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের প্রসঙ্গে। ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র যুবরাজ দেবশ্রী এবং পরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। যৌবনে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ছুটিয়ে প্রবল বলবীর্য ও শৌর্যের পরিচয় দেন। প্রথম বিক্রমাদিত্য শকদের পরাজিত করেছিলেন মাত্র—কিন্তু ইনি তাদের নিশ্চিহ্ন করেন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়েই গুপ্তরাজাদের শাখা-রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় উজ্জয়িনীতে। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ৩৯৯-৪১৩ (অন্য মতে ৩৭৫-৪১৩)—অর্থাৎ যথাক্রমে ১৪ অথবা ৩৮ বছর।

এই নৃপতির দিগ্বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে মেহেরৌলি-স্তম্ভে লিখিত আছে: 'অসিতে যাঁহার যশ ঘোষিত হইয়াছে, বঙ্গে যিনি সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে দলিত করিয়াছিলেন, যাঁহার দ্বারা সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া বাহ্লিক বিজিত হইয়াছিল, যাঁহার শৌর্যবায়ুতে দক্ষিণসমুদ্র আজও সুগন্ধিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার বীর্য দাবাগ্নির ন্যায় সকল অরিকে ভস্মীভূত করিয়াছে, যিনি শ্রান্তহৃদয়ে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার খ্যাতি আজও পৃথিবীতে রহিয়াছে, সেই কীর্তিভুজ বিষ্ণুভক্ত রাজা চন্দ্রের এই স্তম্ভ বিষ্ণুপাদগিরির উপর স্থাপিত হইল।' [আদিযুগ, গৌড়-কাহিনী]

এই রাজা বিক্রমাদিত্যের কালেই ভারতবর্ষে নতুন করে হিন্দু-সংস্কৃতি তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের নবজাগরণ ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এই সময়েই। মহাকবি কালিদাস-সহ নবরত্ন-সভার সহায়তায় প্রাচীন-ভারতীয়

সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। রামায়ণ-মহাভারতের পুনর্লিখন হয়েছিল এ-যুগেই। অতএব এই মতের প্রতি বিশ্বাসের যথেষ্ট হেতু আছে যে, এই নৃপতির আমলেই রামায়ণের আধারে রামজন্মভূমির অনুসন্ধান ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ঘটে। কিন্তু কথা হল, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময়কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী, অথচ একটি সংস্কৃত লেখের মতে: '২৪৩১ যুধিষ্ঠির সংবতের পৌষ মাসের দ্বিতীয় অমাবস্যায় রাজা বিক্রমাদিত্য রামের জন্মস্থানের মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করে রামসীতার বিগ্রহ স্থাপন করেন।' [District Gazeetter Faizabad-1960, p. 354]

কহ্লনের হিসাব অনুসারে যুধিষ্ঠিরাব্দের ২৩৯১ বছর পর বিক্রম-সংবতের শুরু। অতএব ২৪৩১ যুধিষ্ঠির-সংবতে বিক্রম-সংবত হয় ২৪৩১-২৩৯১=৪০ বিক্রমাব্দ। আবার খ্রী·পূ· ৫৭ অব্দ থেকে বিক্রমাব্দের সূচনা হয়। অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্য-নামে সাতবাহনের জনৈক সেনাপতি এখন থেকে ১৯৯০+৫৭=২০৪৭ বছর আগে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২৪৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে বা ৪০ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ৫৭−৪০=১৭ খ্রী·পূ· অব্দে, বা এখন থেকে ১৯৯০+১৭=২০০৭ বছর আগে ঐ মন্দির পুনর্নির্মাণ করান।

'মহাত্মা কোলব্রুক লিখিয়াছেন যে, কিংবদন্তী আছে,' শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান ২৪০০ বৎসর পূর্বে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এরূপ দীর্ঘকালের কিংবদন্তী যে একেবারে ভ্রমশূন্য হইবে তাহা নিতান্ত অসম্ভব। বর্তমান বৎসর হইতে গণনা করিলে খ্রীঃপূর্ব ৫২৮ লব্ধ হইল। অতএব শ্রীদেবকৃত বিক্রমচরিত-মতে তাহার ৪৭০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৮ খ্রী· পূর্বাব্দে বিক্রমাজিত্য বর্তমান ছিলেন, এ নির্ণয় কি অত্যন্ত অসঙ্গত?' [কালিদাস : প্রাণনাথ পণ্ডিত, মাঘ ১২৭৯ বঙ্গদর্শন।]

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজা বিক্রমাদিত্য মন্দির নির্মাণ করান নি—পুনর্নির্মাণ করিয়ে সেখানে রামসীতার বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাহলে এটা স্পষ্টই দেখা যায়, আজ থেকে ২০০৭ বছর আগেও শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির ছিল।

হরিবংশ অনুসারে: অঙ্গাধিপ কর্ণ বলিরাজার সপ্তদশ অধস্তন পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি ভারতযুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন এবং রাজা দুর্যোধনের সুহৃদ—যাঁর অন্য-নাম দাতা কর্ণ। বলিরাজ মহাপ্রস্থানের পূর্বে সমগ্র রাজ্য তাঁর পাঁচ পুত্রকে বিভাগ করে দেন। সেই পাঁচ পুত্রের নামেই তৈরি হয় নতুন পাঁচটি রাজ্য—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্রক ও সুহ্মক।

তখন সত্যযুগের শেষ, ত্রেতার শুরু। অযোধ্যাপতি দশরথের সুহৃদ ছিলেন অঙ্গাধিপ লোমপাদ। সময়ের হিসাবে তা হলে অন্তত ভারতযুদ্ধের ১০০০ থেকে ৮০০ বছর পূর্বে অঙ্গরাজ্যের সূচনা। ভারতযুদ্ধ হয়েছিল এখন থেকে অন্ততঃ পাঁচ-হাজার বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ৩১০২ খ্রী.পূর্বাব্দে। আর্যভট্ট এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। তাহলে রামচন্দ্রের কাল হয় কমপক্ষে ৪০০০ থেকে ৪৫০০ খ্রী.পূর্বাব্দ। বিক্রমাদিত্য সেখানে মন্দির পুনর্নির্মাণ করান মাত্র ১৭ খ্রী.পূর্বাব্দে। তাহলে তার আগেকার ৪০০০ বছরের ইতিহাস কোথায় গেল ? রামজন্মভূমিতে মন্দিরই বা কে স্থাপন করলেন ! সবটাই কি কল্পনা ? তা নয়, সেই সময়ের কথা রামায়ণেই আছে। বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার বাস্তব বিশ্লেষণ রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানে গমনকালে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে প্রজাকুলও দেহত্যাগে বদ্ধ-পরিকর হয়ে তাঁর অনুগমন করে এবং সরযূতে তাঁর দেহত্যাগের সঙ্গে সকলেই হৃষ্টমনে সরযূতে দেহবিসর্জন করে স্বর্গারোহণ করে।

রামায়ণের উক্ত বর্ণনা থেকে যে মর্মান্তিক বিদায়-চিত্র পাওয়া যায়, তাতে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না, শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যদেহ-পরিগ্রহের সঙ্গে-সঙ্গেই সমগ্র অযোধ্যাও শূন্য হয়ে যায়। তৎপরেও যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁরা প্রজাবৎসল প্রিয় রাজার বিরহে সেই শূন্য শ্মশানপুরী পরিত্যাগ করে দেশান্তরে গমন করেন।. তারপর থেকে সমগ্র অযোধ্যা দীর্ঘকাল পাষাণী অহল্যার মতো নিঃসঙ্গ-জীবন অতিবাহিত করে। রামায়ণের সর্বশেষ অংশ তারই উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য : 'অযোধ্যাপুরী বহু বৎসর জনশূন্য ছিল, পরে ঋষভ নামক রাজাকে পাইয়া আবার লোকালয় হয়।' [একাদশাধিকশততম সর্গ, উত্তরকাণ্ড, বাল্মীকি- রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ৯৪৬]

অনেকেই বলতে পারেন, উত্তরকাণ্ড তো মূল রামায়ণ নয়, পরে সংযুক্ত। এই অভিমতকে সম্মান জানিয়েই বলি, তাহলেও আমাদের প্রমাণের হানি ঘটে না। কারণ, রামচন্দ্র-পরবর্তী যুগে অযোধ্যার অবস্থা কেমন হয়েছিল তার বর্ণনা তাতেই আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়। ঐতিহাসিক এস. এলিয়টও মনে করেন, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরে অযোধ্যা জনশূন্য অবস্থায় পরিত্যক্ত নগরী ছিল। 'অযোধ্যায় উপনীত হয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রথম কাজ হল, শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত জন্মস্থান অনুসন্ধান করা। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সে কাজ অতি দুরূহ। 'কোথাও সেই গৌরবময় পুণ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল

না। কারণ অযোধ্যা তখন গভীর জঙ্গলে আবৃত। বড়ো-বড়ো বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যে সে-অঞ্চল সমাকীর্ণ এবং সেখানে অসংখ্য বিষধর সর্পের রাজত্ব। সৃষ্টির প্রথম নগরী বলে এককালে অযোধ্যার প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের তিরোধানের পর তার যে অবস্থা হয়, পৃথিবীর আর-কোনো প্রাচীন রাজধানীর সম্ভবত সে দশা হয় নি।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামজন্মভূমির স্থান-নিরূপণের এই সুকঠিন কাজটি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের নয়। কারণ সময়ের হিসাবে সেটা পঞ্চম শতাব্দী। তখন অযোধ্যা জনমুখরিত—অন্তত, জঙ্গলাকীর্ণ নয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ তৎপূর্বে সেখানে রাজা পুষ্যমিত্র রাজধানী স্থাপন করেছেন এবং বৌদ্ধমঠও স্থাপিত। পুষ্যমিত্রের এক কুমারের প্রদত্ত একলক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা ব্যয়ে জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু সেখানে একটি বুদ্ধ-মূর্তি স্থাপন করেন। সুতরাং শ্রীরামমন্দির যে প্রথম বিক্রমাদিত্যের আমলেই হয়েছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত।

রাজা রামচন্দ্রের দীর্ঘকাল পরে অযোধ্যায় রাজা ঋষভকে আমরা পরবর্তী নৃপতিরূপে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর সময় সঠিক জানা না গেলেও এটুকু অন্তত অনুমান করা যায়, তিনি মহাভারতের পূর্ববর্তী কোনো-এক সময়ের রাজা ছিলেন। দীর্ঘকাল অযোধ্যা জনশূন্য-পরিত্যক্ত ছিল। রাজা ঋষভের শাসনাধীনেই তা আবার জনমুখরিত হয়ে ওঠে। সেই সময়েই রামজন্মভূমির উপরে মন্দির-নির্মাণ ও রামসীতা-লক্ষ্মণ-হনুমান-প্রভৃতির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্তম্ভগাত্রে রামসীতার মূর্তি তখনই অঙ্কিত হয়ে থাকবে। শুধু অনুমান বা নিছক কল্পনামাত্র এ নয়—কারণ গোটা মহাভারত জুড়ে যত্রতত্র শ্রীরামচন্দ্রের কথা ছড়ানো রয়েছে। তাছাড়া মূল মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত রামোপাখ্যান পর্বে রামচন্দ্রের সম্পূর্ণ কাহিনী বিশদভাবে সন্নিবিষ্ট। লোক-সমাজে প্রত্যক্ষ একটা-কিছু না থাকলে সমগ্র সমাজজীবনে তা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় না। সমাজবিজ্ঞানের আলোয় বিষয়টিকে দেখলে এ-যুক্তির সমর্থন মেলে!

যাই হোক, রাজা ঋষভ এই মন্দির-নির্মাণের মাধ্যমে রামচন্দ্রের বিগ্রহ স্থাপন ও স্মৃতিরক্ষা করেন। এতে বোঝা যায়, তাঁর সময় থেকেই রামচন্দ্র নারায়ণরূপে পূজিত হতে থাকেন। মহাভারতের যুগে যে রামপূজা ছিল না তা জোর করে বলা যায় না। কারণ, বিষ্ণু ও সূর্য-উপাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে কৃষ্ণের নারায়ণরূপে পূজা তাঁর জীবিত অবস্থাতেই প্রচলিত হয়। কাজেই কৃষ্ণভক্তের দল বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্বের মহিমা-

প্রচারে অমনোযোগী ছিলেন, তা মনে করা অসঙ্গত নয়। যদিও কৃষ্ণ-বিষ্ণু ও নারায়ণকে একই সঙ্গে এক করে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। এক নারায়ণই কখনও রামরূপে কখনও বা কৃষ্ণরূপে যুগে-যুগে আবির্ভূত হয়ে সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ এবং ভক্তজনকে রক্ষা করেন।

এরপর ভারতযুদ্ধের ফলে গোটা দেশ বীরহীন ও সংস্কৃতিহীন হয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে, পরীক্ষিৎ-ই প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু-নরপতি। পরবর্তী যুগ থেকে সমগ্র হিন্দুধর্মের অবক্ষয়ের সূচনা এবং তা চলতে থাকে অতি দীর্ঘকাল। তারই মধ্যে কোনো-কোনো অঞ্চলে কোনো-কোনো স্বাধীন নরপতি কিছু উৎকর্ষ দেখালেও ভারতের সংস্কৃতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রাখে নি। এই সময়ে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতিসৌধগুলি জীর্ণ হতে-হতে ক্রমে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়।

বুদ্ধ-পরবর্তী যুগে বিশেষ করে সম্রাট অশোকের সময়েই ভারতবর্ষে আবার একটা শিল্প-সংস্কৃতির জোয়ার আসে। কিন্তু তাতে বৌদ্ধদেরই ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে স্তূপ-মঠ-ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়—প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিচিহ্নগুলির সংস্কার হয় নি। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার জাগ্রত হয়। সময়ের হিসাবে ঋষভ থেকে বিক্রমাদিত্যের সময়কালের অন্তর অন্তত তিন হাজার বছর। ততদিনে রাজা ঋষভ-প্রতিষ্ঠিত রামমন্দির হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর মতো একটা ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। লোকশ্রুতি বা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে বিক্রমাদিত্য অযোধ্যায় এসে জঙ্গলময় ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে প্রাচীন মন্দির আবিষ্কার করেন এবং সেখানে সপ্তশিখর-সম্বলিত মন্দির পুনর্নির্মাণ করে অযোধ্যায় নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু এই বিক্রমাদিত্য কে? গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে এই বিক্রমাদিত্য নন এটা নিশ্চিত। যদিও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডার কানিংহাম তাঁকেই বিক্রমাদিত্য বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অযোধ্যায় প্রাপ্ত তাম্রমুদ্রাগুলিতে কোনো উৎকীর্ণ লিপি বা বিদেশী প্রভাবেরও চিহ্ন নেই। 'মুদ্রার উপর হয় হস্তী নয়তো বৃষমূর্তি উৎকীর্ণ। অপর দিকে আছে বেড়াসহ গাছ, স্বস্তিক-চিহ্ন, ৪টি নন্দীপদ, উজ্জয়িনীর একটি ছোট প্রতীক এবং নদী।' [Allan Jan, Catalogue of Coins of Ancient India, Intro. p. LXXXVIII] আর, গুপ্তযুগের মুদ্রায় রয়েছে পরিচ্ছন্ন শিল্পকলার সুস্পষ্ট নিদর্শন। বিশেষ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধিকাংশ

মুদ্রাতে ধনুর্বাণধৃত মূর্তির চিত্র খোদিত' [বাঙলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি প্রাচীন প্রতিকৃতিতে তিনি ধনুর্বাণ-হাতে রামচন্দ্রের ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। খ্রী পূ. প্রথম শতাব্দীতে শেষ মৌর্য-নরপতি বৃহদ্রথকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যিনি দুবার অশ্বমেধযজ্ঞ করা সত্বেও রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নি এবং যিনি জাতিতে শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ। আবার ঐতিহাসিকগণের মতে : 'He usurped the throne of Magadha by slaying his royal master. His dominion extended to the south as far as the Normoda river and include the cities of Pataliputra, Ayodhaya and Vidisha in eastern Malwa'. [History of India, Hindu Period, by L. K. Mukherjee. p. 118.]

তবে কি এই বিক্রমাদিত্য পুষ্যমিত্র-নামের অন্তরালেই আত্মগোপন করে আছেন। কারণ বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের সবকটি গুণই পুষ্যমিত্রে বর্তমান। এটি গবেষণার বিষয়। আমাদের বিশ্বাস, কথাসরিৎসাগরের দ্বিতীয়ার্ধের নায়ক যে-বিক্রমাদিত্য তিনিই প্রথম ঐতিহাসিককালের মধ্যে অযোধ্যায় রামমন্দির আবিষ্কার ও পুনঃনির্মাণ করিয়েছিলেন।

উল্লিখিত 'মুদ্রাগুলি লোককথাকেই সত্য প্রমাণ করছে ; যার থেকে বোঝা যায়, খ্রী.পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে পারমার-বংশীয় বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর এক প্রজাতন্ত্রের নায়ক ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের এক কুমারের থেকে বসুবন্ধু নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত একলক্ষ স্বুবর্ণখণ্ড দান হিসাবে পান। এই অর্থে অযোধ্যায় তিনি এক বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করেন।' [Archaeological Survey Report, Vol. XI, p. 97.]

যাই হোক, উপরিউক্ত তথ্য থেকে এটুকু দেখা যায়, খ্রী.পূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে এযাবৎকাল অযোধ্যানগরীকে আর আগের মতো নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয় নি। বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী নানা সম্প্রদায় এই পবিত্র নগরীকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরিয়ে রেখেছিল। অতঃপর খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকে রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই মন্দিরের সংস্কার করিয়েছিলেন বলে মনে হয়। তার কারণ একাধিক।

প্রথমত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ ও সংস্কৃতচর্চার বিশাল ব্যাপ্তি ঘটে। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলির আমূল সংস্কার সাধন হয় এবং সেগুলি সহজবোধ্যভাবে বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থের আদলে

পুনর্লিখিত হয়। ভাস্কর্যশিল্পেরও প্রভূত উৎকর্ষ ঘটে এই সময়ে; যথা, তিগোড়াব বিষ্ণুমন্দির, এরাণের নরসিংহ-মন্দির, নাচনার পার্বতী-মন্দির, ভারমার শিবমন্দির-প্রভৃতি। আসল কথা, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রায় হাজার বছর পূর্ব থেকেই বৌদ্ধ ও জৈন মঠগুলি শিল্পকর্মের দিক থেকে দৃষ্টি আকর্ষণের উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। তারই উত্তরে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মকে উৎসাহিত করতে কালিদাসাদি নবরত্নসভা। বৌদ্ধসাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উত্তরে একদিকে ভারবি-বিশাখাদত্ত-শূদ্রক-কালিদাস-প্রমুখের যুগান্তকারী সাহিত্যসৃষ্টি, অন্যদিকে নালন্দা-সাঁচীস্তূপের উত্তর উপর্যুক্ত মন্দির ও দেবালয়সমূহ। ষোড়শ শতাব্দীতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা রোধ করতে যেমন এদেশে অনুবাদ-সাহিত্যের বান ডেকেছিল, শুরু হয়েছিল লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে বৈদিক দেবগণের অভিন্নতার ব্যাখ্যা-প্রচার। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুধর্মকে উৎসাহ দানের ব্যাপারটা ছিল অনেকটা তেমনই।

সম্ভবত, এই কারণেই দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য অযোধ্যায় রামমন্দির সংস্কার ব্যতীতও তার স্মৃতি-বিজড়িত আরও ৩৬০টি স্থানে মন্দির নির্মাণ করে অযোধ্যার গৌরব আরও বাড়িয়ে দেন। নিম-পিপল বৃক্ষটির সংলগ্ন মৃত্তিকা-নির্মিত বরাহ-মূর্তিটির গাত্রে অঙ্কিত অস্পষ্ট বিষ্ণুমূর্তি গুপ্তশিল্পকলারই নিদর্শন হতে পারে। কারণ নৃপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন—মেহেরৌলি শিলাস্তম্ভে তার উল্লেখ আছে। আত্মগোপনকারী প্রথম বিক্রমাদিত্যের আমলের কোনো শিল্পের ছাপ আমরা ঐ মন্দিরে নিশ্চিতরূপে পাই না। অবশ্য পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা বিশদভাবে হলে আরও অনেক বিস্ময়কর তথ্য জানা যাবে।

এখন আরও একটি প্রশ্ন বাকি থাকে। তা হল, দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময় তো খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। কিন্তু মন্দিরগাত্রে ও স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিল্পকলার নিদর্শন দেখে ভাস্কর্য-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। তাহলে? মধ্যকার আরও ছ-সাত-শত বছরের শূন্যতার হিসাব কোথায়!

হিসাব আছে শ্রুতি আর স্মৃতির পাতায়। কিংবদন্তী-অনুসারে রাজা বিক্রমাদিত্য খননকার্যের সময় নানারকম শিল্প-অঙ্কিত স্তম্ভ পান। স্মৃতি বলছে, ওগুলো অর্থাৎ স্তম্ভে-আঁকা ছবিগুলো কোন বিশেষ-যুগের শিল্পকলা নয়—রামচন্দ্রের ধ্যানের ব্যাখ্যা। বাস্তবে তাও কি সম্ভব? দেখা যাক, রামচন্দ্রের ধ্যানে কি আছে। এ পর্যন্ত প্রায় দশটি রামচন্দ্রের ধ্যান আমরা

পেয়েছি ; এছাড়া পেয়েছি রঘুবীরের কয়েকটি ধ্যান। তার মধ্যে কিছু ধ্যানে রয়েছে শিবের ধ্যানের ছায়া, আর-কিছু ধ্যানে আছে নারায়ণের প্রতিচ্ছবি। বাকিগুলি শুধুই রামচন্দ্র-বিষয়ক। এখানে তার থেকে তিনটি ধ্যানের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করে ঐতিহাসিক সত্যতা খোঁজার চেষ্টা করছি।

'অযোধ্যা নগরে রম্যে রত্নসৌবর্ণ মণ্ডপে।
মন্দার-পুষ্পৈরাবদ্ধবিতানে তোরণান্বিতে।
সিংহাসনসমারূঢ়ং পুষ্পকোপরি রাঘবম্॥'···

বা

'অযোধ্যা নগরে রম্যে রত্নমণ্ডপমধ্যগম্।
ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্ম্মূলে রত্নসিংহাসনং শুভম্॥
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং নানারত্নপ্রবেষ্টিতম্।
তত্র শ্রীরামচন্দ্রাখ্যং ধ্যায়েত্বজং পরাৎপরম্॥'···

বা

'সরযূতীরমন্দারবেদি পঙ্কজাসনে
শ্যামং বীরাসনাসীনং জ্ঞানমুদ্রোপশোভিতম্॥'···

এবার দেখুন, স্তম্ভগাত্রে অঙ্কিত পুষ্পিত লতাপাতা—সেখান থেকে ফুটে উঠেছে নয়নমনোহারী প্রস্ফুটিত পদ্ম। নানা দেবদেবীর মূর্তি, কেউ-বা পুষ্পশাখা-দ্বারা ব্যজনের ভংগিতে শাখাটি নিম্নমুখে ধরে রেখেছে। আর অংগহীনা নানা নারীমূর্তি রয়েছে স্তুতির ভংগিমায়। কার স্তুতি?

অযোধ্যানগরীতে পুষ্পিত বিতানে রত্নসিংহাসনে পদ্মোপরি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমারূঢ় ; আর তাঁকেই যেন বামাগণ নানা ছন্দে, ভংগিমায় পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছে। কেউ বা পুষ্পিতশাখা-দ্বারা সুরভিত মলয় ব্যজনে ব্যস্ত। এই হল স্তম্ভগাত্রে অঙ্কিত চিত্র—আর ধ্যানেরও অর্থ তাই। কাজেই বিশেষ-কোনো যুগের শিল্পরীতির পরিচায়ক এ নয়, এটি ভাবার্থসূচক। গবেষণার অক্ষমতাকে ঢাকতে জোড়াতালি নয়—বিশেষভাবে লক্ষ্য করার পরই আমাদের এই শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। আরও প্রশ্ন মনে আসে : গাড়োয়াল-রাজাদের শিল্পরীতিতেও এরই আভাস দেখা যায়। কিন্তু সে তো একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। তারও উত্তর খুবই সহজ।

'গাড়োয়ালের রাজাগণ হিন্দুধর্মের রক্ষা ও তার ব্যপ্তির জন্য পদক্ষেপ নেন। প্রাচীন মন্দিরসহ তীর্থগুলির উৎসবাদির বর্ণনা ও নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য

তাঁরা বেশ-কিছু পণ্ডিত নিয়োগ করেন। এই রাজাগণ বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করতেন। এবং সেই সময় তাঁরা সেই সব স্থানের (যেখানে ভ্রমণ করতেন) মন্দিরগুলির সংস্কারসাধন, কোথাও-বা নবনির্মাণ কার্য করাতেন। এবং ব্রাহ্মণদের দান করতেন।' [যুগে-যুগে অযোধ্যার মন্দির, ডঃ গণেশলাল ভার্মা]

'বিক্রম-সংবতের ১০৩৬ সালে আশ্বিন মাসে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে রাজা চন্দ্রদেব অযোধ্যায় স্বর্গদ্বারে পাপনাশিনী সরযূতে স্নান করেন।' [Verse 16 Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 324-327] এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, রামভক্ত সেই নৃপতিগণ শ্রীরামমহিমা প্রচারের জন্য, অযোধ্যার স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ শিল্পকর্মের প্রয়োগ করেছেন অন্যান্য স্থানের মন্দিরে, যাতে রামচন্দ্রের মহিমা সর্বত্র প্রচারিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামচন্দ্র-পরবর্তীযুগে রাজা ঋষভ বা তাঁর বংশীয় যে-কেউই ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, তিনি মন্দিরের ঐ স্তম্ভগুলিতে রামচন্দ্রের অযোধ্যা কেমন ছিল এবং শ্রীরামচন্দ্র আসলে যে নারায়ণ, এই বক্তব্যই চিত্রে তুলে ধরতে চেয়েছেন। চিত্রগুলির মধ্যে মূলত কিছু বক্তব্যই রাখা হয়েছে—তারই মধ্যে যতটুকু শিল্প ফোটার ফুটেছে। গাড়োয়ালের নৃপতিগণ সেই কথাটাই বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে বহুলভাবে প্রচার করেছেন। আর রাজা প্রথম বিক্রমাদিত্য বহুকষ্টে জন্মস্থান আবিষ্কার করেছিলেন, সেই কারণেই সম্ভবত পুনর্নির্মাণের সময় তিনি ভিতের নিচে 'জন্মস্থান'-নামটি খোদাই করে দিয়ে প্রভূত প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। যাতে তাঁর মতো কষ্ট করে আর-কাউকে একাজ করতে না হয়। ধ্বংস হয়ে গেলেও স্থানটির যথার্থ্য-নির্ণয়ে ভবিষ্যতে যেন কোনোরূপ গোলমাল না হয়। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, পুরাতত্ত্ব বলছে খ্রী-পূ. দশম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বহু ভাঙাগড়া হয়েছে ঐ স্থানটিতে। সেই ভাঙাগড়াব পরিপূর্ণ হিসাব পেতে হলে যেতে হবে ফৈজাবাদ শহরে। অযোধ্যায় বসে সে-কাজ হবে না। কারণ অযোধ্যাকে ধ্বংস করে সেই ইটপাথর দিয়েই তৈরি হয়েছে সমগ্র ফৈজাবাদ শহরটি।

তবে একথা ঠিক, পঞ্চম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত অযোধ্যার ইতিহাস আর অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। একটার পর একটা কিছু ঘটেই চলেছে, আজও তার বিরাম নেই। ভি. স্মিথের কথায়, 'একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পঞ্চম শতাব্দীতে পাটলিপুত্র থেকেও অযোধ্যা গুপ্তযুগে বেশী প্রাধান্য লাভ করেছিল।' [Early History of Ancient India : Oxford, V. Smith, p. 310]

সপ্তম শতকে অযোধ্যায় আসেন বিখ্যাত চীনা পর্যটক উয়াং-চুয়াং-পি-কা-শা। অযোধ্যা পরিদর্শন করে তিনি লেখেন: ঐ সময় বিশাখা বা অযোধ্যায় ১০০ বৌদ্ধমঠ ও ৫০টি মন্দির ছিল [T. Walters: Yuan Chowang's Travels in India. London, 1904, p. 373] জৈনদের অধিকাংশ তীর্থঙ্কর সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। তাঁদের পাঁচজন তীর্থঙ্কর আদিনাথ, অজিতনাথ, অভিনন্দনাথ, সুমন্তনাথ এবং অনন্তনাথ কোশল অর্থাৎ অযোধ্যার যুবরাজ।

বর্ধন মৌখরী, পাল, গুর্জর এবং প্রতিহারদের রাজত্বকালেও অযোধ্যা বিভিন্নভাবে স্থাপত্য-শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করে। চণ্ডিকাপুরীর শাসকদের কথা দীর্ঘকাল জনমানসে এক উজ্জল স্মৃতি হিসাবে বিরাজিত ছিল। এঁদের মধ্যে ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ, মকরধ্বজ, সুধন্ব এবং সুহদেলবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে প্রথম দিককার মুসলমানদের আক্রমণ এঁরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৫

সপ্তদশ শতকে, আবদুর রহমান চিস্তি-রচিত মিরাট-ই মাসুদীর মতে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সৈয়দ সালার মাসুদী (গাজি মিঞা) অযোধ্যা দখল করেন। পুরাতন লখনৌ রোড বরাবর গাজি মিঞার অনুগামীদের সমাধি আছে। ১০১৮ খ্রী· গজনীর মামুদ মথুরা ও কনৌজসহ অনেকগুলি শহর ও তীর্থস্থান মাটিতে মিশিয়ে দেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও অযোধ্যায় তিনি ঢুকতে পারেন নি। একটি চান্দেল শিলালিপি থেকে জানা যায়, 'চান্দেল রাজা মামুদকে পরাস্ত করেন।' [Dr. Katare's Article In Indian Historical Quart, Calcutta XXXII, p. 340] মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র আহমেদ নিয়ালতগীন ১০৩২ সালে বারাণসী আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি অযোধ্যা আক্রমণ করতে এলে চন্দ্রিকাপুরীর জৈনরাজকুমার সুহলদেব তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১০৮০ সালে তথাতিগিণ অযোধ্যা আক্রমণে এলে তাঁরও ওই একই অবস্থা হয়।

১১৯৪ সালে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানগণ অযোধ্যা অধিকার করেন। কিন্তু দখল কায়েম করতে পারেন না। মহারাজা জয়চন্দ্র সাহাবুদ্দিন ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে সাহাবুদ্দিন সদলবলে অযোধ্যা দখল করেন—তাঁর সঙ্গে আসেন মৌলবী শাহজুরাণ ঘোরী। এখানে হিন্দুদের পরাজিত করে শুরু হয় লুণ্ঠন; আদিনাথের বিশাল জৈন মন্দিরটি ধ্বংস করা হয়। আদিনাথের মন্দিরটিই পরে শাহজুরাণ ঘোরীর মার্জারে পরিণত হয়। কবিরটিলায় খাজা হাথি এবং মকদুম শেখ বিকার কবরটিও এমনি আরও রূপান্তরের প্রমাণ।

এই সময় থেকেই অযোধ্যায় মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আরম্ভ। অযোধ্যা মুসলিম-অধিকারে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই সেখানে নির্দেশ দেওয়া হয় ইসলামিকরণের। ফলে হিন্দুদের বিরোধিতায় হুশানউদ্দিন উলবগ, নাসিরুদ্দিন মামুদ (সুলতান ইলতুৎমীসের জ্যেষ্ঠপুত্র) মালিক গিয়াসুদ্দিন, নসরৎ তাইস, কামাবুদ্দিন কীরাণ ও তুঘলখান কখনোই অযোধ্যায় শান্তিতে শাসনকার্য চালাতে পারেন নি। জিয়াউদ্দিন বারুণী বলেন, 'পথ-ঘাটের অবস্থা

খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং দোয়াব ও অযোধ্যা-এলাকায় ছিল দস্যুদের উৎপাত। দিল্লির সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তাঘাটগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল।' [Tarikha-I Firozshani : Zioudin Barani : Calcutta (1860) p. 56]

অযোধ্যায় নিযুক্ত মুসলিম শাসকগণ এই হিন্দুবিদ্রোহ (গেরিলা লড়াই) দমন করতে না-পারার জন্য দিল্লি-কর্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হয়েছেন। অযোগ্যতার অপরাধে পদচ্যুত এবং বেত্রাহত হয়েছেন। ১২৭৯ সালে সেখানে নিযুক্ত শাসক হায়বত খানকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়। অপরাধ, তিনি অযোধ্যার হিন্দুদের উপর আধিপত্য-বিস্তারে সক্ষম হন নি। পারেন নি কাউকে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত করতে। এই একই অপরাধে পরবর্তীকালে বলবনের হুকুমে আইতগিন আমিন খানকে অযোধ্যার দ্বারদেশে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় [Ibid, p. 40-83-84]। জালালউদ্দিন খিলজী অযোধ্যার শাসকরূপে তাজউদ্দিন কুচিকে নিয়োগ করেন। আলাউদ্দিন খিলজী তাঁকে বিতাড়িত করেন এবং অনতিকাল পরে কাকা জালালুদ্দিনের মস্তক অযোধ্যায় জনসাধারণের প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়ে দেন। [Ibid, p 235]

দিল্লির সুলতানী ইতিহাসে একমাত্র মহম্মদ তুঘলগই এক হিন্দু 'কিষাণ বজরাণ ইন্দ্রী' (কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র)-কে অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু ফিরোজশাহের সময় এ-নীতির পরিবর্তন হয়। কারণ তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নি। ফলে প্রশাসনের ভিতর সন্দেহের ও ষড়যন্ত্রের গোপন খেলা চলতে থাকে। এই অবকাশে জৌনপুরের সুলতান অযোধ্যা অধিকার করেন।

এই হল দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংক্ষেপে অযোধ্যার ইতিহাস। অনেক ঐতিহাসিকদের মত এই যে, গাজনীর মাহ্‌মুদের ভারত আক্রমণের সময় থেকেই এদেশে মুসলমান-সংস্কৃতির সূচনা হয়। কিন্তু একথা ঠিক নয়। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিন্ধু ও পঞ্জাব ছাড়া আর-কোনো প্রদেশেই মুসলমান প্রভাব-বিস্তারে সক্ষম হয় নি। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে লুণ্ঠন, ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সুলতান মামুদ ১০৩০ খ্রী. ইহলীলা সংবরণ করলে দেখা গেল, হাজার-হাজার হিন্দুমন্দির, বৌদ্ধ মঠ, জৈন স্তূপ ধ্বংস হয়েছে, হিন্দুনারীর সম্ভ্রম গেছে। কিন্তু ইসলামের স্রোত ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই রয়েছে।

সুলতান মামুদের সময় দুজন হিন্দু-সেনাপতি মুসলমান হয়েছিলেন—তিলক আর সুখপাল। মামুদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই সুখপাল প্রায়শ্চিত্ত করে

সদলবলে আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে মুসলমান নেতারা বুঝেছিলেন, হিন্দুধর্মের চতুর্দিকে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তা ভেদ করে এদেশে ইসলামের প্রচার সম্ভব নয়। সুলতান মামুদের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মাসাউদ গাজী (যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি) ফিরে গেলেন বাগদাদে। সেনাপতির বেশ ছেড়ে পীরের খাব্‌কা বা আলখাল্লা পরে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। শুরু হল পরিকল্পিতভাবে মসজিদ-নির্মাণ এবং ইসলামীকরণ। উদারপন্থী হিন্দুরাজাগণ সেদিন এই শান্তিপূর্ণ ভজনালয়গুলিতে সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখেন নি। আসলে তারই মধ্যে আত্মগোপন করেছিল পরবর্তী কালের আগ্রাসী অধ্যায়।

সহসা সেই হিংস্ররূপ কিছুকাল প্রতিহত হয় মোঙ্গলদের হঠাৎ আবির্ভাবে। বৌদ্ধ তমুরচি, (পরে যিনি শামানপন্থীদের উচ্চতম পুরোহিত-কর্তৃক চেঙ্গিজ খাঁ বা দ্যুলকপুত্র উপাধিতে ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে ৫১ বছর বয়সে ভূষিত হন) এরপরই শুরু করেন তাঁর বিস্ময়কর দিগ্বিজয়। গোটা ইসলামিজগৎ কেঁপে ওঠে—তুর্কিরা আত্মগোপন করেন এখানে-ওখানে। সেইসময় বাঙলা দেশে তথা ভারতবর্ষে খাসাউদ গাজীর অনুগামীরা পীরের বেশে আক্রমণ চালিয়ে ইসলামিকরণের যে জাল রচনা কবেছিলেন, প্রমাদ গণনা করেন তাঁরা। অজস্র মসজিদ-মাদ্রাসা-ইত্যাদি চেঙ্গিজ খাঁ ধ্বংস করেন; স্বয়ং খলিফাকে পর্যন্ত মোঙ্গলরা নিষ্কৃতি দেয় নি।

সুলতানা রাজিয়ার মৃত্যুর পর ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বহরমশাহ যখন দিল্লির মসনদে অধিষ্ঠিত তখন মোঙ্গলরা আবার ভারতে আসেন এবং ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করে বহু মুসলমানকে হত্যা করেন। মোঙ্গলদের এই বিরাট অভ্যুত্থানে মুসলমানগণ দিশাহারা হয়ে তুর্কিস্থান থেকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তখন তাঁরা প্রায় ছিন্নমূল। অতএব এটুকু সহজেই বোঝা যায়, খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসে মুসলিমদের ভাগ্য বিড়ম্বিত ছিল। এদিকে মোঙ্গলদের আবির্ভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম অন্তত কিছুকালের জন্য সুরক্ষিত হয়। তারপর আবার পঞ্চদশ শতক থেকে এদেশে মুসলমান আগ্রাসন শুরু হয়—চলে ইংরেজ আমল পর্যন্ত। সে-প্রসঙ্গে আসবার আগে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার।

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে, ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে, সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলমান শাসকেরা বারবার আক্রমণ

চালিয়েছেন এবং প্রতিবারেই পরাজিত হয়েছেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে যদিও অযোধ্যা তাঁদের অধিকারে আসে, তথাপি তাঁরা শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। মুসলমান শাসকগণ তখন সদা-সন্ত্রস্ত থাকতেন। জিয়াউদ্দিন বারুণীর লেখা থেকে তার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই রাজনৈতিক চিত্রের প্রেক্ষাপটে বিচার্য বিষয় হল, এহেন একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মভূমিতে শ্রীরামমন্দির নির্মাণ সম্ভব কিনা। বিশেষত এমন একটি বিশাল শিল্প-কর্ম! একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর অযোধ্যা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি একেবারে রণমুখরিত ছিল। কাজেই একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে, অযোধ্যায় রাম মন্দিরের পুনর্নির্মাণ তখন হয় নি। অতএব এক্ষেত্রে আমার পূর্ববর্তী অভিমতই ঠিক। অযোধ্যায় রামমন্দির পুনর্নির্মাণ হয়েছিল খ্রী.পূ. প্রথম শতাব্দীতে এবং স্তম্ভগাত্রে অঙ্কিত শিল্পকর্ম প্রথম মন্দিরস্থাপন কালেই, রামচন্দ্রের অযোধ্যার চিত্রকাহিনীরূপেই অঙ্কিত হয়েছিল। খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খুব সম্ভবত মন্দিরটির সংস্কারসাধন করেন। কিন্তু ঠিক কি-কি সংস্কার তিনি করান তা নিশ্চিতরূপে বলা যাবে না—কারণ মন্দিরের ৮৪টি স্তম্ভের মধ্যে ১৩টি মাত্র বর্তমান। ঐ স্তম্ভগুলি অক্ষত থাকলে রামায়ণে বর্ণিত মূল কাহিনীর চিত্ররূপ পাওয়া যেত বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং আরও জানা যেত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সংযোজন কতটুকু!

১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লির লোদী সুলতান বাহলুল, অযোধ্যা জয় করে কালাপাহাড় ফরমুলিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অনিবার্যভাবে এইসময় অযোধ্যায় মরণপণ লড়াই চলে। সেখানে মঠ ও মন্দিরগুলির দিকে মুসলমানদের শ্যেনদৃষ্টি, অন্যদিকে জোটবদ্ধ হিন্দুদের মরণপণ সংগ্রাম। এই দু-পক্ষের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে ষোড়শ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত।

এই সময় পর্যন্ত যা-কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলি আংশিকভাবে রক্ষা পেয়েছিল, তার পিছনে ছিল আপামর জনসাধারণ ও হিন্দুরাজগণের মরণপণ সংগ্রাম। সে-সংগ্রামে রাজা-রাজপুত্র থেকে কৃষক-মজুররাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষের সাধুসমাজ। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আখড়া তৈরি করে অস্ত্রশিক্ষা শুরু করেন। আগ্রাসীদের হাত থেকে হিন্দুধর্ম ও মঠ-মন্দিরগুলিকে রক্ষা করার জন্য

একাজ তাঁদের না করে উপায় ছিল না। সম্মিলিত হিন্দুসমাজ এইভাবে সংগ্রাম করে অযোধ্যার মুসলিম-প্রশাসনের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। এর পরই শুরু হয় বাবর-পর্ব।

বাবরের অযোধ্যা-আগমনের প্রাক্কালে সেখানকার শাসক ছিলেন বায়াজিদ ফরমুলি। তৎকালীন পঞ্জাবের শাসক দৌলত খাঁ লোদীকে সাহায্যদানের শর্তে বাবর তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেন; শেষে তাঁকেই রাজ্যচ্যুত করে পঞ্জাবের সিংহাসন দখল করেন। এই হল বাবরের প্রথম ভারত-জয়। তারপর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১ এপ্রিল, পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু দিল্লি জয় করলেও বাবরের আসল শত্রু ছিলেন মেবারের মহারাণা সঙ্গ। তিনিও সজাগ ছিলেন। অবশেষে ১৫২৭ সালের ১৭ মার্চ খানুয়ার প্রান্তরে রাণা সঙ্গকে পরাজিত করে তাঁর পথ পরিষ্কার করেন।

অতঃপর বাবর একজন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে সমস্ত মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং পাঠান-রাজপুত সম্পর্ক বিনষ্ট করতে সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি 'গাজী' অর্থাৎ পৌত্তলিক-হত্যাকারী, 'কলন্দর' অর্থাৎ ধর্মযাজক উপাধি গ্রহণ করেন। রাণা সঙ্গ, মেদিনী রায় এবং অন্যান্য হিন্দুপ্রধান ও নৃপতিদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন।

'১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধের সময় তৎকালীন অযোধ্যার শাসক বায়াজিদ ফরমুলি বাবরের সঙ্গে যোগ দেন। বাবর তাঁকে তাঁর পুরস্কারস্বরূপ অযোধ্যার অর্ধাংশ শাসনের দায়িত্ব দেন। কিন্তু বাবরের এই ন্যায়বিচারে ফরমুলি সন্তুষ্ট না হয়ে বাবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। একথা শোনামাত্রই বাবর অযোধ্যাভিমুখে রওনা হন এবং সেইসঙ্গে চীনতীমুরকে বিদ্রোহ-দমনের ভার দেন। বায়াজিদ ফরমুলি তীমুরের হাতে পরাজিত হয়ে গাজিপুরে চলে যান। এই সময় বাবর ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২ মার্চ অযোধ্যায় পৌছে সপ্তাহকাল ঘর্ঘরা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে অবস্থান করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন এবং তিনি বাঁকি তাসখন্দীকে অযোধ্যার শাসক-রূপে নিয়োগ করেন। বাবরের হুকুমে এই মোগল রাজকর্মচারী অযোধ্যায় একটি মসজিদ তৈরি করে।' [Beveridge A. S., The Baburnama Vol II (1922) p. 527, 679-80, 84-85] and [Report of The Settlement of The Land Revenue Faizabad District, (Allahabad 1880), p. 235.]

'১৯২৮ খ্রী. অব্দে বাবর এইখানে মৃগয়া করিতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে এই মসিদ নির্মাণ করা হয়। মসিদের গায়ে দুইখানি পাথরে ৯৩৫ হিজরা (১৫২৮ খ্রী. অব্দ) খোদিত আছে। এই মসিদ নির্মাণ করাইবার জন্য অনেক দেবালয়ের প্রস্তরাদি খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। জন্ম-স্থানের মন্দির কোষ্টিপাথরে নির্মিত ছিল। বাবরের মসিদে তাহার কয়েকটি স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত মসিদ নির্মাণ করা হইলে দিনকতক হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে অত্যন্ত বিরোধ চলিয়াছিল। তাহার পর অযোধ্যা ইংরাজদের অধিকারে আসিল। সেই অবধি জন্মস্থান ও মসিদের মধ্যে রেল দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানে আর বিরোধ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।'

[বিশ্বকোষ, পৃ. ৫১৯]

বিতর্কিত বাবরনামার প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। এখন শোনা যাক এ-বিষয়ে লোকশ্রুতি কি বলে। অথবা প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্রধারণকারী সাধু-সন্তদের শিষ্যপরম্পরায় প্রবাহিত স্মৃতি। বাবরের মন্দির-অধিকার সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে।

বাবর যখন অযোধ্যায় আসেন তখন সেখানে এক সিদ্ধযোগী বাস করতেন : তাঁর নাম যোগী শ্যামানন্দ। সেই সময় তাঁর কাছে দুজন পীর যোগশিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। যাঁদের একজনের নাম খাজা আব্বাস, অন্যজন জালাল শাহ। তাঁরা এই রামমন্দিরের মাহাত্ম্য অবগত ছিলেন। সেই সময় বাবর অযোধ্যায় এলে তাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে মন্দিরটি অধিকার করে সেখানে মসজিদ-নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেন। বাবর তাঁদের কাছে মন্দির-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে কিছু দ্বিধাবোধ করেন। তথাপি অবশেষে মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার জন্য নির্দেশ দেন মীর বাঁকি তাসখন্দির উপর। মীর বাঁকি সেইমতো কাজ করতে গেলে হিন্দু-মুসলমানে চরম সংঘর্ষ বাধে। পরে তা ঘোরতর যুদ্ধের আকার নেয়। সেই যুদ্ধে প্রায় ১.৭৪ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। মীর বাঁকি কামানের সাহায্যে মন্দির অধিকার করেন এবং মন্দিরের অংশবিশেষ ধ্বংস করে তার উপরে তিনটি গম্বুজ তৈরি করেন।

কিন্তু একাজও খুব সহজে হয় নি। দিনে যে সমস্ত স্তম্ভ তৈরি হয়, রাত্রে তা ভেঙে পড়ে। এদিকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতেই থাকে। অবশেষে মীর বাঁকি বাবরকে এ-বিষয়ে অবহিত করলে তিনি তখন পীর-দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই যোগীর কাছে যান। শেষে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয়, মসজিদ হবে

মন্দিরের আদলে—যাতে হিন্দুরা পুজোও করতে পারে, আবার মুসলমানেরাও নমাজ পড়তে পারে।

শর্ত থাকল: মন্দিরে 'সীতাপাক' (পবিত্রস্থান) কথাটি লেখা হবে। মসজিদের পিছনে কোন চালি তৈরি করা যাবে না। প্রবেশপথে চন্দনকাঠের ফলক রাখতে হবে এবং চারিদিকে থাকবে প্রদক্ষিণের জায়গা।

দ্বিতীয় স্মৃতিটি একজন সিদ্ধ মহাত্মার কাছ থেকে পাওয়া। বাবরের সময়ে যোগী শ্যামানন্দ যখন রামমন্দিরে বসতি করতেন, তখন একদিন রাত্রে এক ফকির এসে সেখানে তাঁর কাছে রাত্রিটুকুর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। যোগীবর তাঁকে বাইরের দালানে রাত্রিবাসের অনুমতি দিয়ে বলেন, প্রভাতের তাঁকে পূর্বেই চলে যেতে হবে; নতুবা হিন্দুরা তাঁকে সেখানে দেখলে শুধু তাঁরই নয়, যোগীবরেরও জীবন বিপন্ন হবে। ফকির তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করে নিশাবসানের পূর্বেই মন্দিরচত্বর ত্যাগ করেন।

কিন্তু সেই ফকির রাত্রে পবিত্র মন্দিরের দাওয়ায় মালা জপ করতে-করতে ঈশ্বরের কৃপায় এক অলৌকিক শক্তি লাভ করেন (পৃথিবীর সমস্ত সাধু-সম্প্রদায়ই মালা জপ করেন—খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু সকলে)। মন্দিরের এই মাহাত্ম্য জেনে তিনি দিল্লির পথে ধাবিত হন এবং বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেই পবিত্র স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের অনুরোধ করেন। আরও জানান, তাতে মুসলমান-ধর্মের প্রভূত উপকার হবে। ফকিরের এই প্রস্তাবে বাবর প্রথমে দ্বিধাবোধ করেন, কিন্তু শেষে তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর করেন। উক্ত ফকিরের মাজার রামমন্দিরের অদূরে এখনও বর্তমান।

এখন দেখা যাক, উপরিউক্ত বিবরণ-দুটিতে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু। প্রথমত, দুটি কাহিনীতেই আছে ফকিরের কথা; নামের ক্ষেত্রেও রয়েছে মিল। তবে প্রথমটিতে ফকির দুজন—শেষেরটিতে পীরের সংখ্যা এক। যোগী শ্যামানন্দের কথা দুটি গল্পেই উল্লিখিত। দুটি কাহিনীতেই ফকিরের অনুরোধে বাবর দ্বিধাবোধ করেন এবং শেষে অনুমতিও দেন।

যা অমিল তা হল, যোগী শ্যামানন্দের সঙ্গে বাবরের সাক্ষাতের পর দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে মসজিদ তৈরি হয়। ফকিরদ্বয় ছিলেন শ্যামানন্দের শিষ্য এবং বাবর অযোধ্যায় দু'বার আসেন। দ্বিতীয় গল্পে খাজা আব্বাসের নাম নেই।

এ-পর্যন্ত বাবরনামা বলে প্রচলিত বইটিতে যে-তথ্য পাওয়া যায় তা হল: অযোধ্যায় বায়াজিদ ফরমুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করায় বাবর সেখানে উপস্থিত

হলে ফকির জালাল শাহ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং মসজিদ তৈরির কথা বলেন। বাবর বাঁকি তাসখন্দীকে অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত করে তাঁকেই মন্দির দখল করে মসজিদ-নির্মাণের ভার দিয়ে আগ্রার পথে রওনা হন। এই সময় তিনি সরযূ ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমস্থলে সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছ-পালা ও হরেক রকম পাখি দেখে তিনি মুগ্ধ হন। অযোধ্যায় সাকুল্যে বাবরের স্থিতিকাল ১৫২৮ সালের ২ মার্চ থেকে ৯-১০ মার্চ পর্যন্ত।

এবার ঐতিহাসিক লোজনের বর্ণনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করি: 'অযোধ্যা থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে ঘর্ঘরা ও সরযূ নদীর সঙ্গমস্থলের কাছেই বাবর ছাউনি তৈরি করান।' সময়টা ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ—বাবর সেখানে ছিলেন পুরো আট দিন। তারপর হুকুম দেন: 'হজরৎ জালাল শাহের ইচ্ছানুযায়ী রামজন্মস্থান বিধ্বস্ত করে তার উপর মসজিদ তৈরির ব্যবস্থা কর।'

বাবর এই আদেশ দিয়ে আগ্রার পথে যাত্রা করলে জালাল শাহের ইচ্ছায় মীর বাঁকি উক্ত ধ্বংস-যজ্ঞ শুরু করেন।

এ-পর্যন্ত উপরে পরপর কতকগুলি অভিমত সন্নিবেশিত হয়েছে। এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, আসলে ঘটনা কি? লক্ষণীয় এই যে, ঘটনার নায়ক আসলে ঐ ফকিব জালাল শাহ। মীর বাঁকি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। বাবর উপনায়ক। অযোধ্যার পূর্বাপর ঘটনার বিবরণ যা পাওয়া গেছে তাতে একথা বিশ্বাস করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, যোগী শ্যামানন্দের সঙ্গে ফকিরের গুরুশিষ্য সম্পর্ক ছিল। সংগ্রাম-মুখরিত অযোধ্যার ইতিহাস মুসলমানদের কোনোদিনই গ্রহণ করে নি। আরও উল্লেখযোগ্য, ধর্মস্থানগুলিকে রক্ষার জন্য যেখানে সাধুসন্তরাই স্বয়ং অস্ত্রধারণ করেছেন, সেখানে শ্যামানন্দের পক্ষেও মুসলমান ফকিরকে শিষ্যত্বে বরণ করার কথা নিতান্তই রটনা ও কষ্টকল্পনা। শ্যামানন্দের সঙ্গে বাবরের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বিষয়টিও পরবর্তীকালে ফকিরদের সংযোজন (একথা বলার পক্ষে আরও যুক্তি আমরা পরে দেব)। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়: জালাল শাহের প্রস্তাবে বাবর দ্বিধাবোধ করেন। এই দ্বিধাবোধের ঐতিহাসিক কারণ কিন্তু অনেক গভীরে।

বাবর জ্ঞাতিশত্রুর ভয়ে তুর্কিস্তান ত্যাগ করে কাবুলে পালিয়ে আসেন। সেখানে গুটিকয় মোঙ্গলকে জোটবদ্ধ করে একটা দল গঠন করেন। তৎপরে পঞ্জাব দখল করে দিল্লি অধিকার করেন। খানুয়ার যুদ্ধে তিনি রাণা সঙ্গকে

পরাজিত করলেও চারিদিকে তখনও হিন্দুরাজ্য বর্তমান। অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে আফগানদের আক্রমণ। এমন অবস্থায় বাবর যখন জালাল শাহের কাছ থেকে অযোধ্যার রামমন্দিরের মাহাত্ম্য ও তার সংগ্রামমুখর ইতিহাস শোনেন, (ফকির যে বাবরকে অযোধ্যায় হিন্দু-একাধিপত্যের কথা, সেখানে ইসলাম ধর্মের গোড়াপত্তনের জন্য একটা মসজিদের প্রয়োজনীয়তা এবং রামমন্দির দখল করে মসজিদ বানাতে পারলে হিন্দু-আধিপত্য বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা বুঝিয়েছিলেন—এমন অনুমান করাও ভিত্তিহীন হবে না; কারণ এই ফকিররা আসলে ছিলেন পলিটিক্যাল ফিলজফার তথা গাইডও)। তখন তিনি এই কারণেই দ্বিধাবোধ করেন। আফগানরা তখন তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ; অন্যদিকে রামমন্দির অধিকার করাও সহজ কর্ম ছিল না। শেষ পর্যন্ত অযোধ্যাটাই যদি হাতছাড়া হয়। এই জন্যই বাবর হয়ত হুকুম দেন: 'হজরৎ জালাল শাহের ইচ্ছানুযায়ী রামজন্মস্থান বিধ্বস্ত করে তাব উপর মসজিদ তৈরির ব্যবস্থা কর।' অতঃপর তিনি প্রস্তুত হতে থাকেন আফগানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

এবার আসা যাক ফকির জালাল শাহের প্রসঙ্গে। ইতিপুর্বে উল্লেখ করেছি, খলিফার আর্শীবাদ ও সাহায্যপুষ্ট মাসাউদগাজী ভারতবর্ষে এসে সেই সময়ে গৌড়কে তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন। আর তখন থেকেই পাকাপাকিভাবে ভারতবর্ষে মসজিদ নির্মাণ হতে থাকে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা মতো। যদিও অষ্টম শতাব্দী থেকে পীরের বেশে মুসলমানগণ এদেশে দলে-দলে আসতে থাকেন ইসলামজগতের মহৎ আদর্শ প্রচার করতে। মাসাউদগাজীর পর বল্লাল সেনের আমলে (১১৫৮-১১৭৯ খ্রী.) 'আদমপীর পাঁচ হাজার অনুচরসহ মক্কা থেকে বঙ্গদেশে আসেন।' [বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস, পৃ. ৭] সম্ভবত এটিই পীরদের সবচেয়ে বড়ো দল। তৎপরে সম্রাট 'আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে গোরাচাঁদ পীর ভারতে আসেন তিন-শ দশজনের একটি বাহিনী নিয়ে।' কিছু পরেই সেই পীরগণ কিভাবে কার্য আরম্ভ করেন তা নিম্নলিখিত চিত্রে পরিস্ফুট হবে। আব্বাস আলির নেতৃত্বে দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে, কাজ শুরু করেন ২১ জন পীর—যথা, আব্বাস আলি (হাড়োয়) মহম্মদ শাহ সুফিসুলতান (পাণ্ডুয়া), দরাব খাঁ (ত্রিবেণী), কোরবান আলি (আরামবাগ), মোমেহুদ্দিন (বনডালা, বর্ধমান), সৈয়দ আবদুল কাদের (বঙ্গোপসাগরের কাছে), আবদুল রতিফ (সোনারপুর), আবদুল্লা আউয়াল (বীরভূম),

মোহাম্মদ হাসান (হাসনাবাদ), মোহাম্মদ দায়েম (ডায়মণ্ডহারবার) ইত্যাদি।' [কালাগুার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী, আবদুল গফুর সিদ্দিকি]।

উল্লিখিত চিত্র থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, কি সুচারু পরিকল্পনা মতো এইসমস্ত পীর তথা মুসলিম যোদ্ধারা এদেশে এসে ইসলামিকরণে উদ্যোগী হন। যথাসময়ে তাঁরা পীরের বেশ ত্যাগ করে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। যার প্রমাণ, বখ্‌তিয়ার খিলজি যখন নবদ্বীপ আক্রমণ করেন, তখন তাঁর নেতৃত্ব দেন পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত তৎকালীন পীর শাহ জালালউদ্দিন। লক্ষ্মণ সেন এই পীরকে একখণ্ড জমি দান করেছিলেন। এই পীরের নির্দেশেই পরবর্তীকালে পাণ্ডুয়ার সমস্ত মঠ-মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়। বরেন্দ্রের বহু হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যাও করা হয়।

বর্তমানে ত্রিবেণীতে যে জাফর খাঁ গাজী ও বড় খাঁ গাজীর সমাধিসৌধ রয়েছে, তা যে হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেই করা হয়েছে, তা যে-কোনো সাধারণ দর্শকও বুঝতে পারেন। ত্রিবেণীর এই সমাধিটি দেখে ডি. মণি সাহেব মন্তব্য করেন : 'There are also near the northern and eastern entrances images of some of the Hindu gods such as Narasinghee, Varaha, Rama, Krishna etc··· It is clear that the building is not now in its original state and that formerly it must have been Hindu temple.' [An Account of the Temple of Triveni near Hugli.—D. Money J. A. S., May 1847] 'আচার্য যদুনাথ সরকার ত্রিবেণীর এই জাফর খাঁর কীর্তিস্তম্ভকে 'a Museum of Muslim Epigraphy' বলেছেন। বিনয় ঘোষ তার সঙ্গে, 'and of Hindu Sculpture' কথাটা যোগ করে সেই মন্তব্যের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। [পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃ. ৪৯০]

মন্দির ভাঙার মাল জমিয়ে রাখা হয়েছিল বলেই জেলার নাম মালদহ। সেকালে সর্বত্রই ছিল পীরদের প্রবল প্রতাপ। ১১৯৪ সালে প্রথম যখন মুসলমান অযোধ্যা দখল করেন সেখানেও ছিলেন পীর—মৌলবী শাহ জুরান ঘোরী। আদিনাথের জৈন মন্দির ধ্বংস করিয়েছিলেন তিনি। এখন সেটাই তাঁর সমাধি।

কিন্তু মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণেও যখন এদেশের মানুষকে বিশেষ ইসলামে দীক্ষিত করা গেল না, তখন আরম্ভ হল অন্য পন্থা। সে আরও ভয়ানক।

হিন্দুদের ভক্তিবাদের শাস্ত্রীয় আধারে শুরু হল অলৌকিক কাহিনী রচনা।

পুরাণ-মঙ্গলকাব্য-নীতিকাব্য-সত্যনারায়ণের পাঁচালির আদলে তৈরি হল পীরের পাঁচালি, সত্যপীরের আখ্যান। উপনিষদের আধারে রচিত হল 'আল্লোপনিষদ'। অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও সন্নিবিষ্ট করা হয়। একাজে সুলতানদের প্ররোচনায় কিছু হিন্দুও সক্রিয় হন [স্বামী অক্ষয়ানন্দ, ইসলাম-রাজত্বে হিন্দুসমাজে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ও জাতিভেদ-প্রবর্তনের ইতিহাস, স্বস্তিকা, দীপাবলী সংখ্যা, ১৩৮৮]। বিভিন্ন হিন্দু-জায়গার নাম বদল করে মুসলমানী নামকরণ করা হয়। আবার দেবলগ্রাম, লক্ষ্মীপুর-প্রভৃতি গ্রামগুলিতে হিন্দু নামটাই আছে—অধিবাসী সমস্তই মুসলমান। অযোধ্যাতেও এর ভূরিপরিমাণ দৃষ্টান্ত রয়েছে। অযোধ্যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, 'সৈয়দওয়াড়া'। রামকোট হয় 'বেগমপুরা', মণিপর্বত 'কাজীপুর', বশিষ্ঠকুণ্ডের নাম 'কাজীয়ানা', রামঘাট 'রহিমবাদ' প্রমোদকানন 'হজরতবাগ'-ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অন্তত এটুকু দেখা যায় যে, উক্ত পীরগণ আবশ্যকমতো বেশ ধারণ ও তথ্য-সংগ্রহ করতেন। তারপর যথাযথ ব্যবস্থাও। কাজেই শ্যামানন্দের সঙ্গে জালাল শাহের সাক্ষাৎ বিচিত্র নয়। কিন্তু তিনি যে যোগীবরকে প্রভাবিত করতে পারেন নি, তাও পরিষ্কার। বাবরের সঙ্গে শ্যামানন্দের, সাক্ষাৎ ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিমতো মন্দিরের মসজিদে রূপান্তর অবশ্যই রীতিমতো পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রচার। ফকিরের এই রচনা প্রায় 'আল্লোপনিষদ'-এরই অনুরূপ। একটু পরেই আমরা সে-প্রসঙ্গে আসব।

৬

এবার আসা যাক বাবরনামা প্রসঙ্গে। এই আলোচনাতেই আমরা সম্পূর্ণ চিত্রটি পাবো। যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রকৃত বাবরের উপস্থিতিতে ঐ মন্দির দখল হয়েছিল কিনা।

তুর্কি ভাষায় লেখা বাবরের যে-ঘটনাপূর্ণ জীবনী 'তুজুক-ই বাবরি'-নামে খ্যাত (যা নাকি বাবরের স্বহস্তে-লিখিত বলে শোনা যায়)—তার আসল পাণ্ডুলিপি এ-পর্যন্ত কোনো মিউজিয়মে পাওয়া যায় নি। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পাণ্ডুলিপিটি কি অবস্থায় ছিল তা আমাদের জানা নেই। শেষে আকবর তাঁর আমলে ১৫৫৯ থেকে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ আবদুল রহিম খান্নার সাহায্যে ৩০ বছর ধরে পার্শি ভাষায় তা নাকি অনুবাদ করান। আকবর সিংহাসনে আরোহণের (১৫৫৬) তিন বছরের মধ্যেই এই কার্যের জন্য খান্না সাহেবকে নিযুক্ত করেন। এবং সম্পূর্ণ বাবরনামাটি পার্শিভাষায় অনূদিত হওয়ার পর তুর্কিভাষায় লেখা সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি নিরুদ্দেশ হয়। জাহাঙ্গিরের পর আর-কোনো মোগল-সম্রাট সে পাণ্ডুলিপিটি দেখতেই পান নি। শুধু তাই নয়, বাবরের শিবিরে একবার আগুন লাগলে নাকি ১৫২৭ খ্রী. ২ এপ্রিল থেকে ১৫২৮-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের বিবরণগুলি পুড়ে যায়। বর্তমানে বাবরনামার যে-অনুবাদটি পাওয়া যায়, তা হল সালার জং মিউজিয়মে প্রাপ্ত পার্শিভাষায় লেখা বিভারীজের ইংরেজী-অনুবাদ। এলাহাবাদ মিউজিয়মের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ এস. পি. গুপ্ত এই তথ্য জানান।

এখন এই রকম একটি অ-প্রামাণিক বাবরনামার উপর কতখানি নির্ভর করা যায়। যদিও বাবরনামার বর্তমান যে ইংরেজি-অনুবাদটি পাওয়া যায় সেখান থেকে ইতিমধ্যে দুবার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তাতে কোথাও নেই যে বাবর ঐ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বা সেই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। হজরৎ জালাল শাহের ইচ্ছানুসারে বাঁকি তাসখন্দীকে মন্দির-দখলের নির্দেশ দিয়ে তিনি আগ্রার পথে অগ্রসর হয়ে যান। বাবর অযোধ্যায় এসেছিলেন বিদ্রোহ দমন করতে, মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়তে নয়।

বাবরের সময় শেষ হয়ে গেছে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর থেকে অযোধ্যায় ভাঙাগড়া হয়েছে প্রচুর। বহু পরিব্রাজক-পর্যটক এসেছেন ; এসেছেন আকবরের পার্ষদগণ। অন্যদিকে অযোধ্যার হিন্দুশক্তি কোনোদিনই নীরব থাকেন নি। তাঁরা মন্দির পুনর্দখলের অভিযান চালিয়েই গেছেন। সুতরাং এটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না, এই সমস্ত সংবাদ আকবর ও তাঁর বাবরনামার অনুবাদকের কানে উঠেছে। সেই কারণেই কি বাবরের শিবিরে আগুন লাগল। বিশেষত, ওদিকে যখন বাবরনামার অনুবাদ চলছে, তখন এদিকে অযোধ্যায় চলছে মরণপণ সংগ্রাম—যার স্বীকৃতি হল, 'সীতা কি রসোই।' বাবরনামায় আগুন লেগে শুধু ২৭-২৮ (মতান্তরে ২৮-২৯) অংশটুকুই পড়ল ! এখন কথা হল ২৭-২৮ বা ২৮-২৯-এর দিনলিপি যদি পুড়েই যায়, তাহলে ইংরেজি বাববনামায় ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ মার্চ থেকে ৯-১০ মার্চের কথা এল কি করে। প্রমাণ : '২রা মার্চ বাবর অযোধ্যায় পৌছে সপ্তাহাধিককাল ঘর্ঘরা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে অবস্থান করে পরিস্থিতি সামাল দেন' [Report of The Settlement of the Land Revenue, Faridabad District, Allahabad 1880, p 235].

'বাবর ঐ স্থানের উপবন-জলধারা-আম্রকানন ও হরেক রঙের পাখি দেখে মুগ্ধ হন। তিনি বাঁকি তাসখতীকে শাসক হিসাবে দায়িত্ব দেন।' [Beveridge A. S. Baburnama, 1922 p. 680]

এই ঘটনা তো ১৫২৮-এর মার্চের। বাবর তখনই অযোধ্যা আসেন এবং মীর বাঁকিকে শাসক নিযুক্ত করেন। যদি বাবরনামার পাণ্ডুলিপি পুড়ে গিয়েই থাকে তাহলে এই কথা বাবরনামায় লেখা হল কেমন করে ?

এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় দু-ভাবে। প্রথমটি হল, আকবরের নির্দেশে বাবরনামার অনুবাদের সময় যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল এবং অপসৃত অংশটুকু ভস্মীভূত হওয়াব গল্প প্রচারিত হয়। কারণ, হিন্দুদের চটিয়ে এদেশে রাজত্ব করা যাবে না, এটা আকবর বুঝেছিলেন। আর তাঁর আমলেই অযোধ্যায় হিন্দুদের নতুন রামমন্দির তৈরি হয় মূলমন্দিরের পাশে। অদূর-ভবিষ্যতে তুর্কি ভাষায় লিখিত মূল পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশিত হলে রাজনৈতিক আবর্ত সৃষ্টি হতে পারে, সেই আশঙ্কাতেই পাণ্ডুলিপিটি নিখোঁজ হয়।

দ্বিতীয়ত, পার্শিভাষায় অনূদিত হওয়ার বহু পরে ইংরেজিতে যখন এই বইটি অনূদিত হয়, ততদিনে অযোধ্যার বিতর্কিত বিষয়টি আরও অনেক ঐতিহাসিকের মাধ্যমে নানাদেশেই প্রচারিত হয়েছে। মিসেস বিভারীজ

তাঁর অনুবাদের সময় সে সব তথ্য-দ্বারা যে প্রভাবিত হন নি, তা নিশ্চিত বলা যায় না।

যদিও একটি জায়গায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা ঐ বইয়ের পাদটীকায় উল্লেখ আছে।

বিতর্কিত সৌধটির ফটকের দু-পাশে পার্শি ভাষায় কয়েকটি ছত্র রয়েছে। শ্রীমতী বেভারীজ তার যে অনুবাদ করেছেন তা এই রকম: 'আকাশস্পর্শী ন্যায়বিচারক, শাহেনশা বাবরের আদেশানুক্রমে মীর বাঁকি দেবদূতগণের অবতরণের নিমিত্ত এই স্থানটি নির্মাণ করেন। তাঁর এই কাজ যেন চিরস্থায়ী হয়।' [এ. এফ. বেভারীজ, বাবরনামা ১৯২২ পৃ. LXXVII] এরই পাদটীকায় লেখিকা জানিয়েছেন, 'একজন মুসলিম হিসাবে বাবর এই হিন্দুমন্দিরের গৌরব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এর একটা অংশ ভেঙে মসজিদ তৈরি করিয়েছেন।'

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক আবার বাবরনামার পাণ্ডুলিপিতে সংযুক্ত মিনিয়েচার দেখিয়ে বাবরকে ধর্মনিরপেক্ষরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। তাঁদের জানা কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিই: বাবর কলন্দর এবং গাজী-উপাধি ধারণ করে রাণা সঙ্গের তথা মূর্তিপূজক হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সর্বোপরি উক্ত বাবরনামায় মিনিয়েচর-সংযুক্তিকরণ ও তার অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং বাবরের প্রপৌত্র আকবর। অতএব এক্ষেত্রে বাবর যে ধর্মনিরপেক্ষ ও মহান রূপে অতি অবশ্যই চিত্রিত হবেন, সে ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কি আছে?

মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে ব্রিটানিকা। প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে এটি অবশ্যই সারা বিশ্বে স্বীকৃত।—'There are few surviving monuments of any antiquity. Ram's birthplace is marked by a Mosque erected by the Mughal Emperor Babur in 1528 on tha site of an earlier temple.' [The New Encyclopaedia Britanica, Vol I, 15th Edition Chicago, p. 751]

গলদ আছে মসজিদ-নির্মাণের হিজরি-সন নিয়েও। কোথাও এটা হিজরি সন ৯৩৫, কোথাও ৯৩৬, আবার কোথাও ৯২৩। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ ২২ জুলাই থেকে হিজরিঅব্দ ধরলে ৯৩৫ হিজরি হয় ইংরেজি ১৫৫৭-৫৮ খ্রী.। সেটা আকবরের সময়, বাবরের নয়। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি শিলালিপিতে এমনি বিপত্তি ঘটেছে। মালদহ জেলার গঙ্গারামপুর থেকে প্রাপ্ত শিলালিপিতে দেখা যায়: 'তারিখ ৬৪৭ হিজরা বা ১২৪৮। এর পরই হল ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজীর মাদ্রাসার

শিলালিপি, ৬১৮ হিজরা বা ১২৯৯ সাল।' [বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পৃ. ৪৯২-৯৫] প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজি সালের সঙ্গে এর হিসাবের বিস্তর পার্থক্য।

অযোধ্যার রামমন্দির-সংলগ্ন প্রস্তরফলকে আছে ৯৩৫ হিজরি ১৫২৮ খ্রী.। আবার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক Dr. H. Narain 'It is undoubtly A Temple : Muslim sources Testify'-'নামের একটি নিবন্ধে, শেখ আজামৎ আলির একটি বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'Even as they cleared up Mathura, Brindaban etc, from the rubbish of non-islamic practices, the Babri Mosque was built up in 923 (?) A. H.'। আরও দৃষ্টান্ত : Mitra Rajab Ali Beg Surur (একজন খ্যাতিমান উর্দু ঔপন্যাসিক : ১৭৮৭-১৮৬৭) লিখেছেন, 'The great Mosque was built on the spot where Sitaki-Rasi is situated during the regime of Babur, the Hindu had no guts to be a match for the Muslim—The Mosque was built in 923 A. H.' (?).

আলি মিঞা আজকের ইসলামী জগতে একটি স্বনামধন্য নাম। এতবড়ো মুসলমান পণ্ডিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ভারতবর্ষে কমই আছেন। যদিও উগ্রপন্থী ইসলামী-সংগঠন 'জামাত-এ ইসলামী'-র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এঁর পিতা মৌলানা হাকিম সৈয়দ আবদুল হাইও একজন তর্কাতীত পণ্ডিত ছিলেন।

তিনি তাঁর 'হিন্দুস্তান ইসলামী আহাদমে' (ইসলামী-রাজত্বে হিন্দুস্থান) গ্রন্থে অযোধ্যা সম্পর্কে লিখেছেন, 'বাবর এই মসজিদ নির্মাণ করান অযোধ্যায় হিন্দুরা যাকে রামচন্দ্রজীর জন্মস্থান বলে অভিহিত করে। তাঁর পত্নী সীতা-সম্বন্ধে একটি কথা বহুল-প্রচারিত, কথিত আছে যেখানে সীতা থাকতেন এবং তাঁর পতির জন্য রন্ধনাদি করতেন, ঠিক ওই স্থানেই বাবর ৯৩৬ হিজরিতে মসজিদ স্থাপন করেন।' প্রসঙ্গত বলা দরকার, এই মন্দিরটি তৈরি হয় আকবরের আমলে বাবরের আমলে নয়।

সব বিষয়েই এত গরমিল কেন? তাহলে কি মুসলমান পণ্ডিতগণ ইংরেজি বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখেন এক, আর উর্দু'পার্শি ভাষায় যখন লেখেন তখন আর-এক? এ-বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ অরুণ শৌরীর কাছে প্রাপ্ত একটি তথ্যের উল্লেখ করি। আলি মিঞার পিতা, মৌলানা হাকিম সৈয়দ আবদুল

তাঁর পূর্বকথিত বইটির উর্দু-সংস্করণে কনৌজের মন্দির-সম্পর্কে লিখেছেন: 'একথা সর্বজনবিদিত যে কনৌজের এই মসজিদ হিন্দু-মন্দিরের উপর নির্মিত হয়েছে।' কিন্তু ঐ একই বইয়ের ইংরেজি সংস্করণে লেখা হয়েছে, 'এই মসজিদ অনেকটা স্থান নিয়ে তৈরি—এরূপ বিশ্বাস, এখানে পূর্বে কোনো দুর্গ ছিল।' বলা বাহুল্য, একাজ এমন একজন পণ্ডিতের অসাবধানতা-জনিত ত্রুটি নয়, স্বেচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

এই ধরনের তথ্যবিকৃতি করার প্রবণতার আরও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে। শেখ আজামৎ আলি (১৮১১-১৮৯৩) ওয়াজেদ আলি শাহের সময়কার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক। তিনি তার 'Tarikhi-Avadh'-গ্রন্থে 'হনুমান গঢ়ি' অধ্যায়ে লেখেন: বৈরাগীদের আক্রমণে হনুমানগড়ি আবার হিন্দুদের দখলে চলে যায় (ঘটনাটা ঘটেছিল সিপাহি বিদ্রোহের সময়)—এবং ঐ সময়ের আরও অনেক ঘটনা। দীর্ঘ একশ বছর ধরে সেই পাণ্ডুলিপিটি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর লাইব্রেরিতে পড়েছিল। কেউই তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। ১৮৬৯ সালে সেই লেখাটি শেষ হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা দরকার, উক্ত পাণ্ডুলিপিটির আর-কোনো কপিও নেই। দীর্ঘকাল পরে ঐতিহাসিক Dr. Zaki Ka-Karowi সে পাণ্ডুলিপি থেকে একটি প্রেস-কপি তৈরি করে, সেটি ছাপানোর জন্য লখনৌ-এর ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ মেমোরিয়াল কমিটির কাছে আর্থিক অনুদান চেয়ে সেটি জমা দেন। ঐ কমিটি লেখাটি পড়ে Dr. Ka-Karawi-কে বলেন, হনুমানগঢ়ি আবার মুসলমানদের দখলে আসে (অর্থাৎ মুসলমানরা আবার সেই স্থানটি পুনর্দখল করে) লিখতে হবে—নতুবা সেটি ছাপার জন্য অনুদান দেওয়া হবে না।

অবশেষে হনুমানগঢ়ি অধ্যায়টি বাদ দিয়ে বইটি ছাপা হয়। পরে Dr. Ka-Karawi নিজের খরচায় কমিটি-কর্তৃক বর্জিত অধ্যায়টি পুস্তিকা-আকারে প্রকাশ করেন এবং তিনি পূর্বোক্ত ঘটনার বর্ণনা করে তাঁর ভূমিকায় দুঃখ করে বলেন, '···That suppression of any part of any old composition or compilation like this can create difficulties, and misunderstanding for future historians and researchers'. [Amir Ali Shahid Aur Marakah-i-Hanuman Garhi : Dr. Zaki Ka-Korawi (1987) p. 3]

এরপরেও কি বুঝতে বাকি থাকে, একদল ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে

অযোধ্যার প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ফকির জালাল শাহ, খাজা আব্বাস, গোরাচাঁদ পীর, মাসাউদ গাজীরা পরিকল্পিতভাবে যার শুরু করেছিলেন, এ হল তারই পরিপক্ক বিষময় পরিণতি।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে তাহলে একথা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্য আছে যে, বাবর মীর তাসখন্দীকে জালাল শাহের ইচ্ছানুসারে মন্দির অধিকারের অনুমতি দিয়ে চলে যান। মীর বাঁকির সাহায্যে জালাল শাহের নেতৃত্বে মন্দির-দখলের লড়াই শুরু হয়। কিন্তু সম্মিলিত হিন্দু-সমাজের যৌথ প্রতিরোধে জালাল শাহ মন্দির-অধিকারে ব্যর্থ হন। দু-পক্ষেই তুমুল যুদ্ধ চলে। শেষে বীভৎস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁরা মন্দিরের অংশবিশেষ ধ্বংস করেন। সম্পূর্ণ মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ-নির্মাণের মতো শক্তি জালাল শাহের ছিল না। যদি তাঁরা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের পরাজিত করতেই পারতেন তাহলে, পাণ্ডুয়ার মসজিদ অথবা ত্রিবেণীর বড়খাঁ গাজীর সমাধিসৌধের মতো মন্দিরের মশলা দিয়ে সম্পূর্ণ মসজিদটিই নির্মিত হত। ঠিক ওই জায়গাতেই হত না—হয়তো তারই পাশে নতুন করে ভিত গেঁথে তৈরি হত একটি মসজিদ।

কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় নি। একদিকে ফকিরের জিদ আর ইসলামিকরণের নেশা, অন্যদিকে হিন্দুদের জীবনপণ সংগ্রাম। এখানকার ভৌগোলিক অবস্থাও হিন্দুদের পক্ষে যুদ্ধের অনেকটা সহায়ক হয়েছিল, যেটা মোগলসেনাদের আয়ত্ত থাকার কথা নয়। যাই হোক, এই সংগ্রামে মীর বাঁকিও হয়তো শেষ পর্যন্ত হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কিন্তু ইসলাম-প্রচারের দৃঢ়সংকল্পে হয়ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত শবের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে, মন্দিরের মশলা দিয়ে তিনটি গম্বুজ উক্ত সৌধটির উপর তৈরি করেন। অনিচ্ছায় হোক, একথা বলার তাৎপর্য এই যে, ঐ লড়াইয়ে হিন্দুদের সঙ্গে অসংখ্য মুসলিমসৈন্যও নিহত হয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক। শুধুমাত্র একটি মন্দির দখল করতে এত বিপুল শক্তির অপচয় একজন সৈন্যাধ্যক্ষ স্বেচ্ছায় নিশ্চয়ই করেন নি।

মন্দির কোনোমতে দখল নিলেও সেখানে তিনটি গম্বুজ ব্যতীত আর কিছুই মীর বাঁকি করতে পারেন নি। কারণ মন্দির-দখলের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ থেকে দলে-দলে হিন্দুরা সেখানে মন্দির উদ্ধারের সংগ্রামে যোগ দেয়। তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তৈরি হয় এক অভিনব পরিকল্পনা। যার প্রকাশ দেখা যায় আর-একটি বাবরনামায় বা বা বাবরের আদেশে। ১৯৩৪ সালের মডার্ণ রিভিউতে এই তথ্যটি প্রকাশিত :

'হিন্দুস্তানের সম্রাট বাবরের আদেশ-অনুসারে এবং হজরৎ জালাল শাহের ইচ্ছানুসারে, অযোধ্যায় রামের এই জন্মস্থল রাজশক্তির অধিকারে নেওয়া হয়েছে, এবং সেখানে কিছু সংস্কার-সাধন করা হয়েছে। হিন্দুদের একটা অংশে পূজার্চনার অনুমতি দেওয়া হলেও তারা খুশি নয়—বরং দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এইজন্য অযোধ্যার শাসনকর্তার প্রতি বাবরের নির্দেশ : কোনো হিন্দু রথ যেন অযোধ্যায় প্রবেশ না করে। যে-কোনো হিন্দু তীর্থযাত্রী অযোধ্যায় প্রবেশ করতে চাইলে বা রক্ষীরা যদি কাউকে সন্দেহ করে তা হলে যেন তখনি তাকে কারাগারে বন্দী করা হয়। সম্রাটের হুকুম যেন কঠোরভাবে পালন করা হয়।' [মর্ডান রিভিউ, ৬ জুলাই, ১৯৩৪]

উল্লিখিত তথ্য থেকে কি-কি পাওয়া যায়? বহু কিছুই পাওয়া যায়। প্রথমেই বলা হয়েছে, 'জালাল শাহের ইচ্ছানুসারে' বাবরের এই নির্দেশ। আর বলা হয়েছে, অযোধ্যায় রামমন্দির রাজশক্তির অধিকারে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ undertaking করা হয়েছে মসজিদ-নির্মাণের জন্য। কিন্তু মসজিদ তৈরি হয় নি—কিছু সংস্কার করা হয়েছে। কিসের সংস্কার? মন্দির না থাকলে কার সংস্কার? অথাৎ রামমন্দিরের অংশবিশেষ ধ্বংস করে খানিকটা মসজিদের আদল তৈরি করা গেছে ঐ মন্দিরের উপর। তবু 'একটা অংশে পূজার্চনার অনুমতি দিলেও তারা দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।' অথাৎ হিন্দুরা ঐ রণাঙ্গণে দাঁড়িয়েও রামচন্দ্রকে রোজই রক্তপদ্ম পুষ্পার্ঘ্য দিয়েছেন এবং মীর বাঁকির চাপিয়ে দেওয়া মিনার-তিনটি ধ্বংস করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। দলে-দলে হিন্দু রাজারা এবং অসংখ্য জনগণ এই প্রতিরোধে সামিল হচ্ছিলেন সারা ভারতবর্ষ থেকে; চলছিল গেরিলা লড়াই। এঁদের সঙ্গে মীর বাঁকি পেরে উঠছিলেন না। শেষের দিকে এই নিয়ে সম্ভবত জালাল শাহের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে থাকতে পারে। এবং সেই কারণে প্রতিরোধের ব্যাপারে তিনি আর খুব-একটা উৎসাহ দেখান না। আর সেইজন্যই অযোধ্যার শাসকের প্রতি বাবরের কঠোর নির্দেশ। আসলে বাবরনামার অন্তরালে জালালনামার সহজে আর-এক কিস্তিমাৎ করার চেষ্টা।

দ্বিতীয়ত, জালালনামার আর-একটি উদ্দেশ্য হল : বহিরাগত হিন্দুদের অযোধ্যায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়ে একদিকে হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দেওয়া, অন্যদিকে অযোধ্যাকে হিন্দুহীন এবং মন্দিরের চিহ্নগুলিকে অবলুপ্ত করে পাকা-পাকিভাবে মসজিদ তৈরি করা। তাই 'কোনো হিন্দুরথ যেন অযোধ্যায় প্রবেশ

না করে এবং যে-কোনো হিন্দু-তীর্থযাত্রী অযোধ্যায় প্রবেশ করতে চাইলে, বা রক্ষীরা যদি কাউকে সন্দেহ করে তাহলে তাকে যেন তখনি কারাগারে বন্দী করা হয়।' এ রীতিমতো চিরুনিতল্লাসী এবং একই সঙ্গে 'স্যুট-এ্যাট-সাইট' অর্ডার। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার ফল হয় বিপরীত।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত হিন্দু-নরপতি তথা আপামর-সাধারণ আরও প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েন অযোধ্যায়। পীরের জীবদ্দশায় আর এই মন্দিরের সংস্কার অর্থাৎ রূপান্তর করা সম্ভব হয় না। আজও সেই অবস্থাতেই আছে রামচন্দ্রের সেই মন্দির।

১৫২৮ এর মার্চ থেকে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে অন্তত চার বার ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। বোঝা যায়, প্রথম বারের অতর্কিত আক্রমণে মীর বাঁকি মন্দিরের খানিকটা অংশ ধ্বংস করে সাময়িক জয়লাভ করলেও, পরবর্তী যুদ্ধে মুসলমান ফৌজ প্রতিবারেই পরাজিত হয়েছে—সম্মিলিত হিন্দুশক্তির সম্মুখে তাঁরা দাঁড়াতে পারেন নি। পারলে কখনই সেই মন্দিরের অস্তিত্ব ওখানে টিকে থাকত না।

মোগলসৈন্য রামমন্দির ধ্বংসে উদ্যত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফৈজাবাদ জেলার ভীটি রাজ্যের রাজা, মহতাব সিংহ, হংসবরের রাজা, বিজয় সিংহ এবং মকরজীর রাজা সংগ্রাম সিংহ মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং এই ধর্মযুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দেন—সেই সঙ্গে অগণিত হিন্দুবীরও। ঐতিহাসিক ক্যানিংহাম লিখেছেন, 'রামজন্মভূমিকে ধ্বংস করার উপক্রম দেখে হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রাণপণে মোগল-আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। যার ফলে একলক্ষ চুয়াত্তর হাজার হিন্দু নিহত হওয়ার পরে মীর বাঁকি কামানের সাহায্যে মন্দির ধ্বংসে সক্ষম হন।'

বারবঙ্কি জেলার গেজেটিয়ারে হ্যামিলটন উল্লেখ করেন, 'হিন্দুদের রক্ত দিয়ে চুন-সুরকির মশলা মেখে মসজিদের ভিত্তি নির্মাণের জন্য জালাল শাহ লাখৌরী ইঁট সরবরাহ করেছিল।' কিন্তু দুঃখের বিষয়, জালাল শাহ ইট সরবরাহ করলেও, মীর বাঁকি সেখানে মসজিদের ভিত্তিস্থাপন করতে পারেন নি। ব্যর্থ হয় নি সম্মিলিত হিন্দুর আত্মবলি!

যাই হোক, ১৫২৮ থেকে ১৫৩০ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-সত্ত্বেও মুসলমান-পক্ষ মন্দিরে সম্পূর্ণ অধিকার পান না। অংশমাত্র দখল-করা মন্দিরের ওপর মসজিদের চিহ্ন রেখে মীরবাঁকি তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ফলে জারি হয়

বাবরনামার নামে জালালশাহনামা। তাতেও কাজ হয় না ; তখনও মন্দির প্রাঙ্গণের ভিতরে-বাইরে অজস্র হিন্দুনিদর্শন বর্তমান। অবশেষে ব্যর্থ ফকির জালালশাহ একটি অদ্ভুত গল্প তৈরি করেন। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি-সংক্রান্ত সেই গল্পে শোনা যায় : মসজিদ হবে মন্দিরের আদলে, বাইরে থাকবে চন্দনকাঠের দরজা, পাশে প্রদক্ষিণের জায়গা এবং ভিতরে বেদীর ওপর রাম-সীতার বিগ্রহ। আসলে আপ্রাণ চেষ্টা করেও মুসলমান ফকির সেই চিহ্নগুলি অপসারিত করতে পারেন নি। নইলে হিন্দুবিদ্বেষী একজন ফকির ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেও হিন্দু-মন্দিরের সুস্পষ্ট চিহ্নগুলির অস্তিত্ব রাখবেন কেন ? ত্রিবেণীর বড়খাঁ গাজী বা পাণ্ডুয়ার মতই মন্দির ধ্বংস করে অযোধ্যাতেও মসজিদ হত। কিন্তু প্রবল হিন্দু-প্রতিরোধের ফলে তা অসম্ভব হয়। কাজেই এমনই একটা কাহিনী না ছড়ালে ফকিরসমাজে জালালশাহের মান থাকবে কেন ? সামান্য একটি মন্দির ধ্বংস হল না বিশেষত বাবরের সাহায্য সত্ত্বেও ! তাই, এ শুধু কিংবদন্তীমাত্র নয়, এর পিছনে ছিল রাজনৈতিক পরিকল্পনা।

ফৈজাবাদ জেলা গেজেটিয়ারের রিপোর্টও এই সিদ্ধান্তর অনুকূলে : 'পুরাতন মন্দিরের এক বড় অংশ নিয়েই মসজিদ নির্মিত হয়। এবং সেখানকার কয়েকটি প্রাচীন স্তম্ভ এখনও ভাল অবস্থায় আছে (এগুলি ঘন গ্রানাইট কৃষ্ণ-প্রস্তরের)—যার উপর বিভিন্ন ব্যাসরিলিফের ভাস্কর্য-শিল্প উচ্চভাবে খোদিত। কাজেই তাতে হিন্দু-ভাস্কর্য সুস্পষ্ট। মূল কাঠামোর বাইরের বীমটি চন্দন কাঠের।' [Faizabad Dist Gazetterop cit p. 352-53]

যাই হোক, এই অসম্পূর্ণ-অধিকৃত মন্দিরে ৯৩৫ হিজরি উল্লেখ করার কারণ একটাই : এই কাজের জন্য বাবরের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল ৯৩৫ হিজরিতে। তাই তাঁকে তুষ্ট করতে এই স্মৃতিফলক। 'সীতাপাক' কথাটি উল্লেখের কারণ আর-কিছুই নয়, মসজিদ নির্মিত হতে পারে নি, অথচ সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত সে স্থানটি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তাই ওটি মসজিদ নয়—মসজিদ হবে বলে নির্দিষ্ট পবিত্রস্থান বা 'সীতাপাক'। স্বয়ং বাবরের নির্দেশের উল্লেখে আরও প্রমাণিত : 'অযোধ্যায় রামচন্দ্রের জন্মস্থান রাজশক্তির অধিকারে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কিছু সংস্কারসাধন করা হয়েছে।' এরপর সেটি যে মন্দির তার আর যুক্তি দেখানো অনাবশ্যক।

অতঃপর শ্রদ্ধেয় সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি : 'তাঁরা জানেন মোল্লা বিদ্বান মৌলবী পণ্ডিত, কোরাণ

তাঁদের কণ্ঠস্বর, আল্লার প্রিয়পুত্র তাঁরা। তাঁরা কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁরা কখনও ইসলামধর্মের সুবিধাবাদী অপব্যাখ্যা করতে পারেন না। কিন্তু অপব্যাখ্যা তাঁরা করেছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।' [ভারত ও সোভিয়েট মধ্য-এশিয়া, বিনয় ঘোষ, পৃ. ৫৬]

বাবরের আমলে রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে যে সংগ্রামের সূচনা হয়, তারপর থেকে অযোধ্যা খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। চলেছে একটার পর একটা সংগ্রাম। মুসলমানরা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছেন সে পবিত্রস্থান, হিন্দুরা দিয়েছেন আত্মবলি। অস্ত্রধারণ করেছেন সাধু-মোহন্তের দল! একবার নয় বারংবার। ১৫২৮ থেকে ১৫৩০ সালের মধ্যে চার-বার ভয়ংকর সংগ্রামের পরও মন্দির মুসলমানেরা দখল করতে পারেন নি। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন হুমায়ুন।

এ দিকে জালাল শাহের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সম্মুখীন হতে হিন্দুরা গোপনে বড়ো আকারের জোট বাঁধছিলেন, প্রস্তুত হচ্ছিলেন সাধুসন্ন্যাসীরাও। এমন সময়ে বাবরের মৃত্যুতে কিছুটা সুবিধাই হল। সে-বছরই অন্যান্য সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে এলেন স্বামী মহেশ্বরানন্দ। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মহেশ্বরানন্দের সঙ্গে যোগ দেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা, হংসবরের রাণী জয়কুমারী এবং সেইসঙ্গে তিনসহস্র নারী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে হংসবররাজ বিজয়সিংহ মীর বাঁকির সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

স্বামী মহেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে প্রথম যুদ্ধে জয় হয়। মন্দির পুনরায় হিন্দুদের অধিকারে আসে। কিন্তু মোগলবাহিনীর দ্বিতীয়বার আক্রমণে যুদ্ধ হয় ঘোরতর। এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন হংসবরমহিষীসহ অজস্র বীরাঙ্গনা। লুণ্ঠিত হয় অনেকের সম্ভ্রম। রামমন্দির উদ্ধারের ইতিহাসে ভারতীয় নারীদের আত্মত্যাগের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁদের সেই মহৎ আত্মত্যাগের কথা চিরকালই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সেই সময়ে সমগ্র উত্তরভারতের হিন্দু-সম্প্রদায় সেই রক্তাক্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে সূর্যসাক্ষী করে শ্রীরামের নামে শপথ করেন : 'জন্মভূমি উদ্ধার হোয় যা দিন বৈরী ভাগ, ছাতা, পগ পনহী ঔর-ন বাঁধহি পাগ'—অর্থাৎ যতদিন না শত্রুজয় করে আমরা রামমন্দির মুক্ত করতে পারি, ততদিন আমরা ছাতা মাথায় দেব না, জুতা পরব না, পাগড়িও বাঁধব না।

উত্তেজিত হিন্দু-সম্প্রদায় ক্রোধে-ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন। সুযোগ পেলেই

ঝাঁপিয়ে পড়েন মন্দিরের উপর। হিন্দু-রমণীদের গৌরবময় আত্মত্যাগের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারেন না। দল বেঁধে আসেন, পুজো দেন, প্রদক্ষিণ করে ফেরার পথে ধ্বনি দিয়ে যান : 'জয় শ্রীরাম—ন বাঁধহি পাগ।' হজরৎ শাহ জালালউদ্দিন হতবুদ্ধি : এত করেও হিন্দুদের দমন করা গেল না। সত্যিই এই এক জাতীয় দুর্দমনীয় শক্তি। ততক্ষণে অযোধ্যার শাসক বদল হয়। ফকির জালালশাহ শেষের দিকে কতকটা নৈরাশ্য বোধ করেন, তাঁর দিনও তখন অবশেষ।

এদিকে হিন্দুরা মন্দিরের উপরের সেই গম্বুজ ভাঙতে না পারলেও নতুন করে আর-কিছু করতে দেন নি। জনশক্তির কাছে রাজশক্তির এ পরাজয়। অতঃপর হুমায়ুনের দশ বছরের শাসনকালের আট বছরই শুধু দখল আর পুনর্দখলের সংগ্রাম। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জালাল শাহ জন্মস্থানে মসজিদের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। ১৫৩৬ খ্রী. নাগাদ তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর সংগ্রামী জীবনের অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

জালালশাহ ফকির—তিনি সুবাদার নন, মনসবদার নন, উজীর নন, আমীরও নন। তিনি সম্রাটের কাছে সম্মানিত, মুসলিমদের কাছে আল্লার দূত। ইসলামের প্রচারের জন্যই তো তাঁর এত সংগ্রাম। কিন্তু আর্যভূমির প্রাণপুরুষের জন্মভূমি যে অযোধ্যা। ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির জন্মভূমিতে মসজিদ গড়ে উঠলে তিনি তৃপ্তিলাভ করতেন। তবু তিনি অমরত্ব পেয়েছেন। রামমন্দির দর্শনের পর তাঁর সমাধিস্থলটি পরবর্তী যুগের একটি দর্শনীয় স্থান।

হুমায়ুনের আমলে অযোধ্যায় রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল : স্বামী মহেশ্বরানন্দসহ রাণী জয়কুমারী ও তাঁর নারীবাহিনীকে হত্যা করে মন্দির পুনর্দখল নেন মুসলমানগণ। এইসময়ে মোট যুদ্ধ হয় দশবার— যদিও ইসলামের প্রচারের চাইতে আফগানদের হাত থেকে রাজ্য রক্ষা করাটাই ছিল হুমায়ুনের কাছে জরুরি। পাঠানবীর শের শাহের কূটবুদ্ধির কাছে হেরে গিয়ে তিনি কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরলেন আগ্রায়। তারপর তিনি তাঁর গর্ভবতী মহিষী হামিদাবানুকে নিয়ে যাত্রা করলেন কাবুলের পথে।

এদিকে নেতৃত্ববিহীন মোগলবাহিনী দিশাহারা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট, মনে হয়, অযোধ্যার হিন্দুদের পক্ষে মন্দির পুনর্নির্মাণে ছিল সুবর্ণসুযোগ। কারণ সময়ের হিসাবে ১৫৪০-১৫৫৬, এই

১৬ বছর সময় কম নয়। কিন্তু অপরদিক থেকে দেখলে এই সময়টা তৎকালীন হিন্দু-নরপতিদের ক্ষেত্রেও দুঃসময়। একদিকে মোগল, অন্যদিকে পাঠান, তারই মাঝে পর্তুগীজদের আক্রমণ। সবদিক প্রতিরোধ করে নিজ-নিজ রাজ্য রক্ষা করাই তাঁদের পক্ষে হয়ে উঠেছিল দুঃসাধ্য। তদুপরি দীর্ঘসময় ধরে অযোধ্যার মন্দিরের জন্য দলে-দলে হিন্দুর মৃত্যুবরণ এবং জয়-পরাজয়ের বিলম্ব ভিতরে-ভিতরে তাঁদেরও ক্লান্ত ও দুর্বল করে তুলেছিল।

৭

পাঠান আমলে অযোধ্যায় রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে বড়ো-কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায় নি। হুমায়ুনের রাজত্বের ২৬ বছর পরে সম্রাট আকবর দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন।

মহামান্য আকবরের অনেক গুণ ছিল। এদেশের অনেক উপকারও নাকি তিনি করেছেন। সরাসরি মন্দির ধ্বংস করে হিন্দুধর্মের উপর নৃশংস আঘাত তিনি করেন নি, তবে ভিতর থেকে হিন্দুধর্মের মূল উৎপাটনের জন্য তাঁর পরিকল্পিত প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। যা ইতিপূর্বে আর-কোনো মোগল-সম্রাট করতে পারেন নি। বাবর বুঝেছিলেন, এদেশে হিন্দুধর্মের ভিত এতই সুদৃঢ়, এতই প্রাচীন, যা কামান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বটবৃক্ষের ন্যায় এই বিশাল মহীরুহের শিকড় একটা নয়, অসংখ্য।

আকবর দেখলেন, এ-পর্যন্ত এদেশে যত সংখ্যায় মঠ-মন্দির ধ্বংস হয়েছে, মসজিদ তৈরির সংখ্যা তার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আবার সংখ্যায় যতগুলি মসজিদ তৈরি করা হয়েছে, এদেশে ইসলামধর্মে রূপান্তরিতের সংখ্যা তার চেয়েও কম। অতএব অন্য পথ চাই। তিনি ভারতের হিন্দু-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তাতে এদেশের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের সহযোগিতা লাভ করলেন খুব সহজেই ; ইতিপূর্বে আর কোনো সম্রাট তা পান নি।

হিন্দুধর্মের যা-কিছু প্রাচীন ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক চর্চা তা শুধু উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নবর্তী হিন্দুদের সে রসাস্বাদনের অধিকার ছিল না। অস্পৃশ্য বলে তাঁদের দূরেই রাখা হয়েছিল। মুসলমান আগ্রাসনের ফলে এবং পীর-ফকিরদের রচিত নানান গল্পকথার মায়াজালে মুগ্ধ হয়ে, শুধুমাত্র ধর্মীয়স্থানে অবাধ অধিকারের আশাতেই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকেন। কিন্তু তাতে তাঁদের বিড়ম্বনা বেড়েছিল বৈ কমে নি।

খোদ তুর্কি ও কাবুলি মুসলমান সম্রাট-বাদশা-উজির-আমিরের কাছে যে সুব্যবহার, সুযোগ-সুবিধা পেতেন, এদেশের সদ্য-দীক্ষিত মুসলমানেরা তার কণামাত্রও পেতেন না। ফলে হিন্দুধর্মে তাদের ঠাঁই গেল, ইসলাম তাদের

আপন করল না। এই দেখে, পরবর্তীকালের নিচুতলার হিন্দুরা আর সে পথে গেলেন না। ফলে ইসলামের স্রোত থমকে রইল। তৎপরে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে পূর্ব-ভারতে যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা সমগ্র দেশে মানুষের হৃদয় আলোকিত করে।

আকবর দেখলেন, নিম্নবর্তী হিন্দুদের মুসলমান করে বিশেষ একটা লাভ হবে না; দেশ শাসনের এবং ইসলামের ভিত্তি দৃঢ় করতে চাই এদেশের শিক্ষিত প্রভাবশালী মানুষ। যাদের হাত করতে পারলে, স্বাভাবিকভাবেই নিচু তলার হিন্দুরা তাঁদের অনুসরণ করবে। মন্দির ধ্বংস না করেও মসজিদের সংখ্যা বাড়ানো যাবে। তিনি বিবাহ করলেন রাজপুত রমণী; খাতির করলেন বড়ো-বড়ো সঙ্গীতজ্ঞ এবং সংস্কৃতির শীর্ষস্থানীয় মানুষদের।

আকবরের এই সুপরিকল্পিত অভীপ্সা অবগত হয়েছিলেন সেই সময়ের অন্তত একজন মানুষ—তিনি হলেন স্বামী বলরামাচারী। দক্ষিণ ভারতের কোয়েম্বাটুরের অধিবাসী স্বামী বলরামাচারী গড়ে তুললেন এক সুসংহত বিরাট যুবসংগঠন। আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তিনি। এগিয়ে এলেন অযোধ্যায় রামজন্মভূমি উদ্ধারের জন্য। দু-পক্ষের যুদ্ধ এবং বহু হতাহত হল। একবার নয়, দু'বার নয়, অন্তত ২০ বার স্বামী বলরামাচারীর রামমন্দির দখলের চেষ্টা চালান। আকবরের সৈন্যরাও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে বিরত হয় নি।

অযোধ্যার রামজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ দেখা দেয় আকবরের প্রশাসনে। হিন্দু-রাজা, হিন্দু-সেনাপতি, বীরবল, টোডরমল-প্রমুখেরাও আকবরের বিরুদ্ধে বেঁকে বসেন। শেষের দিকে স্বামী বলরামাচারী দু'বার রামমন্দির আক্রমণ করলে হিন্দু-সেনাপতিরা পালটা আক্রমণে বড়ো-একটা উৎসাহ দেখান না—বরং পরোক্ষভাবে সুযোগই করে দেন।

এইরকম একটা রাজনৈতিক সংকট দেখে আকবর প্রমাদ গুণলেন। খোদ সৈন্যদলেই বিক্ষোভ? বিক্ষোভ এদেশের রাজরাজড়াদের মধ্যেও? অসন্তোষ এদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভিতর। এদিকে কাবুলে বসে তাঁর ভাই মীর্জা হাকিম হিন্দুস্তানে আকবরী-শাসনের পতন ঘটানোর জন্য চক্রান্তে তৎপর। এমন অবস্থায় অগত্যা আকবর এক কৌশল করলেন।

প্রথমেই হিন্দু-রাজাদের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য এক হুকুম জারি করলেন। 'বিতর্কিত সৌধটি যেমন আছে থাক—তার পাশে একটি আলাদা মঞ্চ তৈরি করে ছোট্ট একটা মন্দির হোক। এবং হিন্দুদের পূজার্চনায় যেন বিরুদ্ধপক্ষের

কোনো আঘাত না আসে। আইন-ই-আকবরীতে এ-ঘটনার উল্লেখ আছে। দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন আকবর এইভাবে সম্মিলিত হিন্দুদের, আবেগের নিম্নচাপকে কৌশলে ধ্বংস করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, হিন্দুদের এই সামান্য ছাড়টুকু দিলে তাঁরা পাশের নতুন মন্দিরটিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন এবং কালে-কালে হিন্দু-আবেগ নিঃশেষ হলে উক্ত সৌধটি মসজিদই হয়ে যাবে।

ভবিষ্যতে হিন্দুরা যাতে দানা বাঁধতে এবং জন্মভূমি নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্যও কৌশলে পাকাপাকি ব্যবস্থা করলেন তিনি।

অযোধ্যার শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি দ্বিখণ্ডিত করলেন। অযোধ্যার খানিকটা অংশ যোগ করলেন এলাহাবাদ-সুবার সঙ্গে, আর বাকি-অংশটা জুড়ে দিলেন জোনপুরের শাসনাধীন অঞ্চলে। এখানেই আকবরের হিন্দুপ্রীতির শেষ হল না। তাকে একেবারে নির্মূল করার জন্য, পৃথকভাবে শুধু অযোধ্যাকেই শাসন করার জন্য, নিয়োগ করলেন দু-জন শাসনকর্তা। একজন ফতে খাঁ, অন্যজন কাসিম আলি। এবং এদের সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত হলেন আরও দুজন—যথাক্রমে দেওয়ান মোল্লা নাজির ও তারাচাঁদ বক্সী। [যুগে-যুগে অযোধ্যার মন্দির, ডঃ গণেশলাল ভার্মার লেখা থেকে সংকলিত]

অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে আকবরের এই নিচ্ছিদ্র ব্যূহরচনার উদ্দেশ্যই হল, পরবর্তীকালে রামজন্মভূমি-উদ্ধারের জন্য কোনো আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই যাতে সূতিকাগৃহেই শেষ হয়। এদিকে আবার রামসীতার মূর্তি-সম্বলিত মুদ্রার প্রচলন করে হিন্দুদের মন জয়ও করেন। দীবানী আকবরীতে উল্লেখ আছে: 'রামজন্মভূমিকে মুক্ত করার জন্য হিন্দুজনগণ ২০ বার আক্রমণ চালায়। জালালুদ্দিন আকবর বীরবল ও টোডরমলের পরামর্শে একটি ছোট্ট রামমন্দির নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন।' যার ফলে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একটানা সংগ্রাম চালিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝি হিন্দুরা মন্দিরের একটি অংশে পাকাপাকি দখল পায়।

প্রসঙ্গত এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এদিকে রামমন্দির নিয়ে যখন আন্দোলন চলছে এবং আকবর তার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা করছেন, তখন অন্যদিকে বাবরনামার অনুবাদ চলছে (বাবরনামার অনুবাদকাল ১৫৫৯-৮৯ এই ত্রিশ বছর)। কাজেই বাবরনামর ২ এপ্রিল ১৯২৭ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৫২৮ পর্যন্ত, (মতান্তরে ১৫২৮-২৯) পাণ্ডুলিপি আগুনে লেগে পুড়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। হুমায়ুন যখন নগ্নপদে অনাবৃত-

মস্তকে আগ্রায় এসে পৌছান এবং সেখান থেকে নিঃস্ব-রিক্ত অবস্থায় রাজকোটে যান, তখন বাবরনামার অবস্থা কেমন ছিল তা আমাদের জানা নেই। অবশ্য অগ্নিকাণ্ড তো আগেই ঘটে গেছে—আবার অনুবাদের পর মূল পাণ্ডুলিপিও নিখোঁজ হয়ে গেল। হায় রে ইতিহাস! 'Suppression or compilation like this can create difficulties and misunderstanding for future Historians and researchers!' ধন্যবাদ Dr. Ka-Karawi!

হিন্দুদের সর্বপ্রাচীন ইতিহাস-রচয়িতা ব্যাসদেব তাঁর কলুষিত জন্ম-বৃত্তান্তও গোপন করেন নি। আত্মজীবনী লিখেছেন মহাত্মাজি—তার অনেক কথা উল্লিখিত না হলে হয়ত ভালো হত; কিন্তু তা সত্যের সমার্থকও হত না।

যাই হোক, আকবরের আমলে অযোধ্যার রামমন্দিরের আপাতগ্রাহ্য লাভ যেটুকু হয়েছিল, তা হল, বীরবল ও টোডরমলের পরামর্শক্রমে মূল মন্দিরের পাশে একটি ছোট্ট নতুন মন্দির স্থাপন—যেটি 'সীতা-রসোই' নামে পরিচিত। কিন্তু তিনি সুকৌশলে সেখানকার সংগ্রামের ভিত্তিকে দুর্বল করে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের অত্যাচারের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন—যার প্রমাণ পাই ঔরঙ্গজেবের মধ্যে দিয়ে। মধ্যবর্তী সময়ে আরও দু-জন মোগল সম্রাটের দর্শন মেলে—তাঁরা জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান।

পীর সেলিম চিস্তির কৃপায় আকবর তাঁর পুত্রের মুখদর্শন করেন বলে তাঁর প্রিয়পুত্রের নাম রেখেছিলেন, সেলিম। পীরের কৃপায় তাঁর জন্ম হলেও পীরের নির্দিষ্ট পথে অর্থাৎ ইসলামের প্রচারের জন্য মন্দির ভাঙার চাইতে, নিত্যনতুন ভোগবিলাসে জীবন কাটানোই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে সেইসব গুণের সমাবেশ ঘটে। মদ্য-অহিফেন ও নারীমাংসপ্রিয়, নৃশংস এই মানুষটি পারতেন না হেন কাজ ছিল না। আবুল ফজলের মতো মণীষীকে তিনি হত্যা করেন। আরও অনেক প্রকার নৃশংসতায় তিনি অলংকৃত।

জাহাঙ্গীরের সময় থেকেই পরিবারের মধ্যেই সিংহাসনের দখল নিয়ে প্রায়ই বিবাদ চলতে থাকে। চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র নিয়েই তাঁদের জীবনের অনেক অংশ কাটে। তাছাড়া ছিল নানাস্থানে বিদ্রোহ। বাকি সময়টা কেটেছে নিজেদের ভোগবিলাসে, যার সূত্রপাত হয়েছিল আকবরের আমলে। এখানে তার খানিকটা তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। 'সন্ধ্যা হলেই বাদশাহের সামনে বারোটি কর্পূরের বাতি নিয়ে সোনার বাতিদানের উপর বসিয়ে জেলে রাখা হত; পরে বিচিত্র বসনভূষণে-বিভূষিতা সুন্দরী

ষোড়শী কামিনীরা সুমধুরকণ্ঠে প্রণয়সঙ্গীত করতে-করতে বাদশাহের সামনে উপস্থিত হত। বাতিদানসহ একটি করে বাতি নিয়ে অপূর্ব নৃত্য ও অঙ্গ-ভঙ্গিমা করতে-করতে বাদশাহকে আরতি করত'। কৃষ্ণমন্দিরে গোপীগণের আরতির অনুকরণে আকবরের এই বিলাসিতা। পরোক্ষভাবে হিন্দুধর্মের পদস্থ ব্যক্তিদের প্রতি হয়ত ব্যঙ্গই। 'চারিদিকে উঁচু প্রাচীরঘেরা একটা প্রকাণ্ড মাঠ, তার মধ্যে এক-একদল বেগমের জন্য একেকটা মহল তৈরি থাকে। দু-তিনটি মহলের মধ্যে একটা করে বাগান, বাগিচা, পুষ্করিণী ও কূপ। এই প্রকাণ্ড মহলকে বলে, হারেম। এক-একটি হারেমে পাঁচ-সাতশ-হাজার করে বেগম থাকে···প্রত্যেক বেগমেরই মাসোহারা নির্দিষ্ট থাকে। বয়স ও রূপগুণানুসারে মাসোহারা কমে-বাড়ে।' [ফ্রান্সিস গ্লাডউইনের আইন-ই-আকবরির বাংলা ভাষান্তর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৪৪]

আকবরের আমলে যে বিপুল বিলাসযজ্ঞের সূচনা হয় তার পরবর্তী আমলে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। ইসলামের প্রসারে তেমন মনোযোগী ছিলেন না।

তাছাড়া একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী মুসলমান যেমন ইসলাম-ধর্মের প্রচারের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, হিন্দুরাও তো সেই পাঁচ-শো বছর নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। মুসলিম আগ্রাসনের সেই প্রথম-লগ্ন থেকেই এদেশে একদিকে রাষ্ট্র-নায়ক ও অন্যদিকে ধর্মাচার্যগণ সম্মিলিতভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ব্যর্থ করেছেন। সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করে সুলতান মামুদ সেখানে ৫০ হাজার মানুষকে হত্যা করে যখন গাজনি ফিরে যাচ্ছিলেন, হিন্দুরা তখন তাঁকে হত্যা করতে না পারলেও, হিন্দু সেনাপতি তিলক তাঁর পুত্রকে হত্যা করে তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন।

মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে হত্যা করে রক্ষা পান নি। জনৈক ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে গক্কড়-সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা তাঁকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। এই ঘটনার কিছু পরেই পৃথু-নামক এক যোদ্ধার নেতৃত্বে অযোধ্যার হিন্দুরা নিজেদের ভূভাগ থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করে। এরপর দিল্লির সুলতান আলতামাস পুনরায় অযোধ্যা দখল করেন, কিন্তু শাসনপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। ক্রমে আসাম, উড়িষ্যা ও উত্তরভারতে মেবার এবং দক্ষিণে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের নৃপতিগণ এই বিদ্রোহে মিলিত হন। রাণা কুম্ভ, রাণা সঙ্গ এবং ঔরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত রাণা রাজসিংহ মোগলদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন।

অন্যদিকে সেই সময় কয়েকজন ধর্মাচার্যের ঐতিহাসিক আবির্ভাবে হিন্দু সমাজে নবজাগরণ দেখা দেয়। বাংলায় শ্রীচৈতন্য, আসামে শঙ্করদেব, মহারাষ্ট্রে নামদেব, পঞ্জাবে নানক প্রমুখ। অযোধ্যায় স্বামী মহেশ্বরানন্দের সশস্ত্র বিপ্লব (১৫৩০) এই অনুপ্রেরণারই ফলশ্রুতি। নবদ্বীপের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন কালিঘাটের তান্ত্রিক সাধুরা। তাঁদের নেতৃত্বেই সাধারণ মানুষ খড়্গ-হাতে এগিয়ে আসে এবং নবদ্বীপ দখল করে।

ভারতবর্ষের এই দুর্দিনে হিন্দুরমণীগণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। হংসবরের রাণী জয়কুমারীও তাঁর সঙ্গিনীদের কথা আগেই বলা হয়েছে। তার আগে সুলতান মামুদের সময় সহস্র-সহস্র হিন্দুরমণী তাদের মাথার বেণী কেটে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পাঠাতে থাকেন এই স্মারক হিসেবে যে, যুদ্ধে পরাজয় হলে তাদের জাত যাবে, যাবে সতীত্ব! এই সময় থেকেই শুরু হয় জহরব্রত। রাজা দাহিরের পরাজয়ে মহারাণী রাণীবাঈয়ের নেতৃত্বে ষোল-শত সিন্ধুবালা জহরের আগুনে আত্মাহুতি দেন।

পুরুষ রণাঙ্গণে, নারী জহরাগ্নিতে আত্মাহুতি দিল। কিন্তু পথেঘাটে? সে ব্যবস্থাও করলেন হিন্দু পণ্ডিতগণ। ঋতু-দর্শনের পূর্বেই তাদের পাত্রস্থ করার বিধান দিলেন। তখন স্বামীই তাদের রক্ষাকর্তা। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে? স্মার্ত রঘুনন্দন, প্রাড়বিবাক জীমূতবাহনের দেওয়া পূর্ববর্তী বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে, পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন সহমরণের। কারণ যে-অঞ্চলে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং মুসলমান আগ্রাসন চলছে, সেখানে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরমণীদের সহমরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

বাংলা, বিহার, অযোধ্যা, রাজপুতানা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র-প্রভৃতি অঞ্চলে অনুরূপ বিধবারা দলে-দলে আত্মোৎসর্গ করেন। সতী-সাবিত্রীর দেশ এই ভারতবর্ষ। মুসলমান জেহাদ-এর বিরুদ্ধে এও এক মর্মন্তুদ সংগ্রাম। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ইন্দোনেশিয়াতেও মুসলমান আগ্রাসন শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হিন্দুপ্রধান বালি ও লম্বক দ্বীপেও সতীদাহপ্রথা চালু হয়।

প্রসঙ্গত বলা যায়, মহাভারতের শ্লোকের ব্যাখ্যা বিকৃত করে বলা হয়, সে-যুগে সতীদাহ প্রথা ছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়। জীমূতবাহনের বিধানেও সতীদাহের উল্লেখ নেই। সেখানে বিধবা রমণীর ব্রহ্মচর্য-পালনের বিধান ও করণীয় কথাই লেখা আছে। এই প্রথার চল হয় মুসলমানদের হাত থেকে

হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্যই। কিন্তু তার অনেক পরে এই প্রথাকে কুৎসিত ব্যবসা ও স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আকবর এই সত্যটিকে উপলব্ধি করছিলেন বলেই মন্দির ভাঙার উপর গুরুত্ব না দিয়ে মিতালি-স্থাপনের পথই গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এই অমোঘ সত্যটিকে সে-ভাবে উপলব্ধি না করলেও এটা বুঝেছিলেন যে, হিন্দু ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপক হস্তক্ষেপ ছাড়া আর যাই করা হোক, তারা সইবে। কিন্তু ধর্মে আঘাত করলে, জোটবদ্ধ হয়ে তারা প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকেই ক্ষমতাচ্যুত করবে। এমনিতেই তো তখন ছল-চাতুর্যে সিংহাসন-দখলের লড়াই চলছে—তার উপর বিলাসিতা। কাজেই অযোধ্যার মতো একটি দুরূহ বিষয়ে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন নি।

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে অযোধ্যায় মন্দির-দখলের লড়াই হয় নি। মুসলিম-আক্রান্ত মূলমন্দিরের পাশে নতুন মন্দিরে তারা পূজার্চনা করেছে এবং মূলমন্দিরও প্রদক্ষিণ করেছে। বাবর-পরবর্তী যুগ থেকে শাহজাহানের আমল পর্যন্ত কোনো মুসলমান যে ওখানে একা বা দলবেঁধে নামাজ পড়তে গেছেন, তার কোনো প্রমাণ এখানকার কোনো গেজেটে পাওয়া যায় না।

আবার নতুন ভাবে অযোধ্যায় রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম আরম্ভ হয় হিন্দু-বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে অরোহণ করেন। ২০ বছর পরে তিনি অযোধ্যার শাসকদের 'ফতেও-আ' জারি করেন: 'মূর্তি-পূজকদের মন্দির ও টোলগুলি ভেঙে ফেলতে'। সম্রাটের এই কালা ফার্মান জারি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র উত্তরভারত উত্তাল হয়ে ওঠে। 'মুতাসিবেরা চারিদিক ঘুরে মন্দির ভাঙার কাজে লেগে যায়। এই সময়েই ধ্বংস হয় অযোধ্যার হনুমানগড়ি মন্দির, নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ভেঙে ফেলা হয় রামকোর্টের ত্রেতা কি ঠাকুর মন্দির। মূর্তিগুলিও নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।' ফৈজাবাদ জেলা-গেজেটিয়ারে ৩৫২-৫৫ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে।

মন্দিরভঙ্গের অভিযানের ফলে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হয়। সপ্তদশ শতকেও ভারতবর্ষে অনেক রাজা ও জমিদার ছিলেন, যাঁরা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁরা মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তদানীন্তন বিদেশী পর্যটক থেভেনঠ্-এর রচনা থেকে জানা যায় যে, সে-সময় অযোধ্যায় দুটি বিরাট প্যাগোডা ছিল। [Indian Travels of Thevenot and Careeri : S. N. Sen. p. 87-88]

ঔরঙ্গজেব শুধু অযোধ্যা নয় সারা ভারতবর্ষেই ইসলামিকরণ শুরু করেন। এর ফলে অযোধ্যাসহ সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু-সম্প্রদায় আবার ফুঁসে ওঠেন। আবার নতুন করে জ্বলে ওঠেন ভারতবর্ষের সাধু-সন্ন্যাসীর দল। ঔরঙ্গজেব সমগ্র অযোধ্যা-শহরকে হিন্দুহীন-মন্দিরহীন করতে সেখানে বিরাট মোগলবাহিনী প্রেরণ করেন। তখন অযোধ্যায় পরশুরাম মঠের সমর্থ গুরু রামদাসের শিষ্য বৈষ্ণবদাস মহারাজ মোগল-সেনাপতি জাঁহাবাজ খাঁয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এদিকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ক্ষত্রিয়-নরপতিগণ। ওদিকে গুরুগোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখ সৈন্যবাহিনীও এসে যোগ দেয় বৈষ্ণবদাস মহারাজের সঙ্গে।

দশহাজার চিমটেধারী সাধু ও বিশাল ক্ষত্রিয় ও শিখবাহিনীর সঙ্গে বৈষ্ণবদাস বাবাজি ঝাঁপিয়ে পড়েন মোগলসৈন্যের উপর। মোগল সেনাপতি জাঁহাবাজ খাঁ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে অযোধ্যা ছেড়ে পলায়িত হন। এই সময়ে হিন্দুরা মোগলদের ত্রিশ বার আক্রমণ করেন। জন্মভূমিসহ সমগ্র অযোধ্যায় ধর্মস্থানগুলি আবার হিন্দুদের দখলে আসে। ঔরঙ্গজেব আলমগীরনামার ৬২৩ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন : 'কাফেররা ত্রিশবার মোগলসৈন্যকে আক্রমণ করে, শেষবার আক্রমণ আসে গুরুগোবিন্দ সিং ও বৈষ্ণবদাসের যৌথনেতৃত্বে। অসাবধানতার ফলে শাহিফৌজ পরাস্ত হয়। সেই যুদ্ধে শাহজাদা, মনসবদার হাসান আলি খাঁ নিহত হন।'

ফৈজাবাদ গেজেটিয়ারে এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে ক্যানিংহাম লেখেন : 'এবার শাহী-সৈন্যবাহিনী নিশ্চলভাবে শুধু তামাসা দেখেছিল। সংগ্রাম এমন ভয়ঙ্কর-রূপ ধারণ করেছিল যে, বর্ণনা করা কঠিন। দিবারাত্র যুদ্ধ চলে; শেষে শাহিসেনা পরাস্ত হয়। তৎপরে আবার চত্বর পুনর্নির্মিত হল, মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল।'

অযোধ্যার সেই রক্তাপ্লুত রণাঙ্গণ এখন শঙ্কর-চবুতরা বা সন্ত-সমাধি-নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে প্রায় দশ-হাজার হিন্দুসেনা নিহত হয়। নিহত হয় অসংখ্য মুসলমানও। যুদ্ধের এই ভয়াবহতাকে স্মরণে রাখতে মুসলমানেরা এই স্থানের নাম দিয়েছেন, শহিদগঞ্জ। পরাজয়ের এই গ্লানি কাটিয়ে আবার চার বছর পরে অর্থাৎ ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব অযোধ্যা আক্রমণ করেন। অতর্কিত এই আক্রমণে হিন্দুরা পরাজিত হয়। এবারেও সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ঔরঙ্গজেব আলমগীরনামায় ৬৩০ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন : 'চার বছর পর শাহিসৈন্যরা রমজানমাসের সপ্তম দিনে

অযোধ্যা আক্রমণ করে। ঐ যুদ্ধে দশ হাজার হিন্দু হালাক হয় ; চবুতরা (মন্দির-সংলগ্ন চত্বর) ও বতুখানা (দেবস্থান বা মন্দির) সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।'

সাময়িকভাবে মুসলমান অযোধ্যায় রামমন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মস্থানগুলিতে দখল নিলেও হিন্দুদের প্রতিহত করতে পারেন নি। সমসাময়িক পরিব্রাজকদের রচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতালীয় পর্যটক নিকোলা মানুচী সে-সময় অযোধ্যা পরিভ্রমণ করে লেখেন : 'অযোধ্যা ও অন্যান্য স্থানের দেবালয়গুলিতে তখনও বহুসংখ্যক হিন্দু একসঙ্গে আসতেন ; এমনকি যেগুলি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সেখানেও তাঁরা এসে দর্শন ও পূজা-নিবেদন করতেন।' [Niccola Manucci : Storia Do Mugar (London 1907), Vol. III ; p. 244-45]

উক্ত ভগ্ন মন্দিরগুলিতে পরিক্রমা ও পূজা দেওয়ার অর্থই হল, হিন্দুদের দখলিস্বত্ব বজায় রাখা। অন্যদিকে শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে (নারায়ণ ভট্টের ত্রিস্থলী ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রমতে) মন্দির বা বিগ্রহ ভেঙে ফেলা হলেও, এমন-কি ম্লেচ্ছ-শাসনের ফলে উক্ত স্থানে পূজানিবেদন বা স্নান করা না গেলেও ঐ তীর্থ বা দেবালয় বা স্থান প্রদক্ষিণ করলেও সমান পুণ্যলাভ হয়। বলা বাহুল্য, যবন-অধিকৃত ভারতবর্ষের দেবস্থানগুলিকে সাধারণ মানুষ যাতে বংশ-পরম্পরায় চিহ্নিত করতে ভুল না করে, ভুলে না যায়, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা—সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই উক্ত বিধান দেওয়া হয়েছিল।

১৭৬৭ সালে অযোধ্যা পর্যটন করে, জার্মান পর্যটক টিফেন থেলার লিখেছেন, 'এই মসজিদের মধ্যে একটি বেদী আছে ; সেই বেদীর স্থানে রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, এই বিশ্বাসে হিন্দুগণ এইস্থানে পূজা দিতেন।' ত্রিসন্ধ্যা ঘুরে বেদীমূল প্রদক্ষিণ করে, সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। 'বিশেষত রামনবমীর দিনে সেখানে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হত।' ১৬০৮-১১ সালে অযোধ্যা পরিদর্শন করে উইলিয়াম ফিনচে এই একই কথা লিপিবদ্ধ করেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবা সুখবাসী রামবেদীর লেখা 'গুরু নানক বংশ-প্রকাশ'-গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লেখ আছে : শ্রীশ্রীগুরু নানক অযোধ্যায় পুণ্যময় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি দর্শনে আসেন। সরযূর পবিত্র সলিলে অবগাহন করে তিনি রামমন্দিরে শ্রীরামবিগ্রহ দর্শন করেন : 'সরযূ জল মজ্জন কিয়া দরশন রামনীহার।'

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্টিন-সাহেবও অযোধ্যা পরিদর্শনের সময় একই চিত্র দেখেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই মুঘলসাম্রাজ্য তার সামগ্রিক গৌরব হারাতে

শুরু করে। আকবরের কূটনীতির ফলে এদেশে হিন্দুক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়েও খুব-একটা বিপত্তি দেখা দেয় নি। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা আবার নতুন করে হিন্দুসমাজকে ক্ষিপ্ত করে। এই সময়ে হিন্দুধর্ম হতে ধর্মান্তরিত অধিকাংশ মুসলমানরাও ঔরঙ্গজেবের এই কাজে বিশেষ একটা উৎসাহ দেখান নি ; তার কারণও ছিল।

ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় থেকে দীর্ঘ চারশ বছর ধরে মুসলমানরা আক্রমণ চালিয়েও ভারতবর্ষ অধিকার করতে পারেন নি, ধর্মবিস্তার তো দূরের কথা। বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকজন পীরকে খুব ভালোভাবে শিক্ষা দিয়ে আর্যভূমিতে পাঠানো হয়। তাঁরা এসে এখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে, অর্থব্যয় করে ইসলামিকরণের একটা পরিকল্পনা করেন। তারপরে দলে-দলে পীরগণের আগমন ঘটে। এঁদের সহযোগিতায় সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুকূল হাওয়া তৈরি হওয়ামাত্রেই কিছু-কিছু জায়গা দখল করেন। কিন্তু, আর্যাবর্তের তুলনায় তা কতটুক ?

ইসলামী রাষ্ট্রের কাল্পনিক গল্পের স্বর্গসুখে বিশ্বাসপ্রবণ হিন্দুদের সমর্থনে ইসলাম বিজয়ী হল। কিন্তু তারপর দেখা গেল, তুর্কিরা ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বিশ্বাস না করে দ্বিতীয়-শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করলেন। তার প্রমাণ ১৯৫০ সালেও দেখা যায়। ফেরোজ খাঁ নুন যখন পূর্ববাংলার গভর্ণর ছিলেন, সেই সময় প্রকাশ্যেই এক সভায় বলে ফেলেন যে, 'পূর্ববাংলার মুসলমানরা খাঁটি মুসলমান নয়।' [কামালুদ্দিন আহম্মদ, স্বাধীন পূর্ববাংলা (ঢাকা), পৃ. ৮৫]

গোলাম মহম্মদের শাসনকালে সীমান্তের চারসাদা নামক একটি উচু স্থানের মসজিদে খোদাই খিদমগার দলভুক্ত কয়েক হাজার নরনারী জুম্মার নামাজ পড়ার সময় তাঁদের হিন্দুকাফের আখ্যা দিয়ে জালিয়ান ওয়ালাবাগের ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের মতো নির্বিচারে মেসিনগান চালিয়ে হত্যা করা হয়। (স্বাধীন পূর্ববাংলা, পৃ. ১১০-১১৪)। কিন্তু ততক্ষণে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস। লুণ্ঠিত ধনরাজি বণ্টিত হয়েছে সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে। সুন্দরী রমণীদের আবাসস্থল হয়েছে সৈন্যাধ্যক্ষদের হারেমে।

'কানান্না সো উম্মাতান ওয়াহেদাতান।'

—সমগ্র মানবমণ্ডলী একজাতি-একপ্রাণ, এখানে ছোট-বড়ো উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই।

'লা-হু-মা ফিচ্ছামাওয়াতে ওয়া মা ফিল আর দে।'

—এ পৃথিবীর আকাশ-বাতাস সবই আল্লার। যত ধন-সম্পত্তি মণি-রত্ন সবই তাঁর। আমরা এখানে মাত্র দুদিনের তরে।

'অমা হা জেহিল হ্যায়া-তোদ দুন্য়্যা ইল্লালাহ্‌ বোঙ অ-লায়েব।'

—এই পার্থিবজীবন অর্থহীন, ক্রীড়া-কৌতুক ভিন্ন অন্য-কিছু নয়।

পীরদের কাছ থেকে পবিত্র কোরাণের এই ব্যাখ্যা শুনে, সেইসব ভ্রান্ত আদর্শবাদীরা, যারা ধরে নিয়েছিলেন, ইসলাম এসে এ দেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, তাঁদের ভ্রান্তি দূর হতে সময় লাগে না। কিন্তু ঘরে ফেরার রাস্তা তখন আর নেই। হিন্দুদের কাছে তাঁরা ধর্মত্যাগী, তুর্কিদের কাছে তাঁরা অনাদৃত। এই কলঙ্কতিলক ললাটে নিয়ে তারা বেঁচে রইলেন এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমান-সম্প্রদায় হিসাবে। যাই হোক তাঁরা সেদিন আর ঔরঙ্গজেবের হয়ে প্রাণপাত করেন নি।

ঔরঙ্গজেবের আমল থেকেই ইংরেজ-শক্তি প্রবল হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা এদেশের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতায় পরিণত হন। মন্দির ভাঙার পর্ব শেষ হয়। কিন্তু অযোধ্যাপর্বে আরম্ভ হয় আরও এক নতুন অধ্যায়।

১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের শেষ-আক্রমণের পরে অযোধ্যায় বেশ কয়েকবার শাসক পরিবর্তন হয়। 'সরবুলন্দ খাঁ, আবুনিশান খাঁ, হিম্মত খাঁ, জবরদস্ত খাঁর মতো মোগল-কর্মচারীরা শত চেষ্টা করেও অযোধ্যার হিন্দুদের নিরস্ত্র করতে কিংবা হিন্দু-তীর্থযাত্রীদের জন্মভূমিতে যাওয়া বন্ধ করতে পারেন নি। অতঃপর সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় বুদ্ধি খাটিয়ে ছাবিলা রামের ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিধারী-নাগরকে অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু সৈয়দশাসনের অবসানে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত হন সাদত খাঁ বারহামুল মুল্‌ক। তিনি তালাইয়ের রাজা মোহনসিংহকে পরাস্ত করেও রাজপুতদের প্রতি-আক্রমণের ভয়ে ত্রস্ত থাকতেন। লক্ষ্মণঘাটে তাঁর দুর্গ থেকে খুব কমই বাইরে আসতেন। শেষে নিজের জীবন সংশয়াপন্ন দেখে অযোধ্যা পরিত্যাগ করে নিকটস্থ কেওড়ার জঙ্গলে শিবির স্থাপন করেন এবং সেখানকার নাম রাখেন ফৈজাবাদ।' [যুগে-যুগে অযোধ্যার মন্দির, ডঃ গণেশলাল ভার্মা]

এই ফৈজাবাদ শহর স্থাপনের মাধ্যমেই মুসলমানরা অযোধ্যার উপর শেষ-আঘাতটি হানেন। মন্দিরও ধ্বংসস্তূপের রাশি-রাশি ইঁটপাথর-স্তম্ভ-প্রভৃতি মালমশলা নিয়ে যাওয়া হয় কেওড়ার জঙ্গলে। তৈরি হয় এক মাইল

প্রস্থ ও আড়াই মাইল দীর্ঘ ফৈজাবাদ শহর। (Archaeological Survey of India Report, Vol I, p. 321] এইজন্যই পূর্বে বলেছি, অযোধ্যার শিল্পকর্মের বয়সের হিসাব অযোধ্যায় বসে হবে না, সে-হিসাব করতে হবে ফৈজাবাদের ইটের দেওয়াল থেকে। বিদেশী গবেষক হ্যান্স বক্কর তাঁর গ্রন্থে ফৈজাবাদ থেকে প্রাপ্ত কতকগুলি বিষ্ণুমূর্তির ছবি দিয়েছিলেন। বিষ্ণুভক্ত রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়, মনে হয়, সে-সমস্ত শিল্পকর্ম অযোধ্যায় স্থাপিত হয়েছিল।

মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের ফলে হিন্দু-আক্রমণের ভয়ে এখানকার শাসকগণ অযোধ্যার পাট চুকিয়ে ফৈজাবাদে চলে যান। হিন্দুরা আবার তাঁদের ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরটির সংস্কারে মন দেন। মন্দিরগুলি সংস্কার হয়। সরযূতীরস্থ ঘাটগুলির পুনঃনির্মাণ এবং কোথাও-কোথাও সংস্কার করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের স্থলে একটি নতুন মন্দির স্থাপিত হয়। হোলকার রাণী অহল্যাবাঈ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই মন্দিরটি আবার সংস্কার করান। পরবর্তী সময়ে স্বর্গদ্বার ও অন্যান্য মন্দিরগুলির সংস্কার হয়।

অতঃপর ইংরেজ-আমল। তখন রামমন্দির আরও এক জটিল লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়। তার আগে মন্দিরবেষ্টিত বিশাল অযোধ্যানগরী দীর্ঘকাল মুসলমান-অত্যাচারের ফলে কি রূপ ধারণ করেছিল, তা একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক। সপ্তম শতকে চীনা পর্যটক উয়াং চুয়াং পি-কা-শ'র বিবরণ থেকে জানা গেছে: 'সে-সময় অযোধ্যায় ১০০টি বৌদ্ধমঠ ও ৫০টি বিশাল মন্দির ছিল।' তা ছাড়াও আরও ছোট-খাটো মন্দির যে ছিল তা সহজেই অনুমেয়। প্রায় শতাব্দী-পূর্বেও অযোধ্যার অবস্থা ছিল এরূপ :

'অযোধ্যায় এখন সর্বসমেত ৯৬টা মন্দির আছে; তাহার মধ্যে ৬৩টা বিষ্ণুমন্দির এবং ৩৩টা শিবমন্দির। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদের ৩৬টা মসিদ আছে।' [বিশ্বকোষ ১, পৃ. ৫২১]

হাজার বছরের মুসলমান-তাণ্ডবে সেখানে অবশিষ্ট কয়েকটি প্রধান মন্দিরগুলির অবস্থা হয় নিম্নরূপ :

প্রাচীন মন্দির	ধ্বংসসাধন ও পরিবর্তন	বর্তমান অবস্থা
১। স্বর্গদ্বারের নিকট মুরাওটোলার আদিনাথ জৈন মন্দির।	১২৯৪ সালে শাহাবুদ্দিন ঘোরী এটি ধ্বংস করেন। শাহ জুরান ঘোরীর সমাধিসৌধ এখানে স্থাপিত হয়। [F.D.G. 1960, p. 353]	মার্জার বা সমাধি।

প্রাচীন মন্দির	ধ্বংসসাধন ও পরিবর্তন	বর্তমান অবস্থা
২। বিক্রমাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত অশ্বমেধ-যজ্ঞক্ষেত্রে রামসীতার মন্দির।	সুলতানী আমলে বিধ্বস্ত ১৬৫৮ সালে সম্ভবত একই স্থানে কুলুর রাজা 'ত্রেতা-কা ঠাকুর' মন্দির নির্মাণ করেন। ঔরঙ্গজেব সে মন্দির ধ্বংস করে মূর্তি ফেলে দেন সরযূতে। ১৭৮৪ সালে অহল্যাবাঈ সেখানে আবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সরযূ থেকে বিগ্রহ উদ্ধার করে কালে রাম-কা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। [Faizabad Dist. Gazetteer (1960) p. 351-555]	ত্রেতা কি ঠাকুর ও কালে রাম কা মন্দির।
৩। নগরকেন্দ্রে জন্মস্থান বা রামজন্মভূমি-মন্দির (বরাহবিগ্রহ-সংলগ্ন)।	বারংবার বিধ্বস্ত। বাবরের হুকুমে ১৫২৮ সালে বিধ্বস্ত। প্রাচীন মন্দিরের তিনটি গম্বুজ বসিয়ে নির্মিত মসজিদ। হিন্দু-নিদর্শন বিদ্যমান [Ibid]	বিতর্কিত তীর্থ-স্থান : এই মন্দির নিয়েই বর্তমান বিতর্ক।
৪। স্বর্গদ্বার তীর্থমন্দির।	গাড়োয়ালরাজ চন্দ্রদেব-প্রতিষ্ঠিত, ঔরঙ্গজেব-কর্তৃক বিধ্বস্ত। পরে হিন্দু-অধিকৃত [Report of the Settlement of the land Revenue, Faizabad District (Allahabad 1880), p. 234]	স্বর্গদ্বার-ঘাটে নতুন মন্দির।
৫। মণিপর্বতে পূর্বতন চার-বুদ্ধের পদচিহ্ন-রক্ষিত মঠ।	তুর্কিদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। পরে মুসলিম প্রাসাদরূপে নির্মিত হয়। [Archaeological Survey Of India, Report Vol I, p. 324]	শিশ ও আয়ুব পয়গম্বরে সমাধি।

প্রাচীন মন্দির	ধ্বংসসাধন ও পরিবর্তন	বর্তমান অবস্থা
৬। অশোক-নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ।	বুদ্ধের ধর্ম-উপদেশ-স্থানে নির্মিত ২০০ ফুট স্তূপ। সুলতানী আমলে বিনষ্ট [Ibid, 324]।	মণি-পর্বতের ধ্বংসাবশেষ।
৭। দন্তধাবণ বৃক্ষ-সংলগ্ন মঠাদি।	মুসলমানদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং মুসলিম-সমাধি-নির্মাণে ব্যবহৃত [Ibid, p. 326-27]	মুসলিম সমাধি।
৮। ভিক্ষুণী বিশাখা-(ধনদেবের স্ত্রী ?) প্রতিষ্ঠিত পূর্বরাম মঠ।	গৌতমবুদ্ধ ছয় বছর যেস্থানে ছিলেন, সেইস্থানে নির্মিত মঠ তুর্কিরা ভেঙে ফেলে [Ibid, p. 324]।	সুগ্রীব-পর্বতের ধ্বংসাবশেষ।
৯। রামকোটে হনুমান-গঢ়ি মন্দির।	ঔরঙ্গজেব ধ্বংস করে সম্ভবত মসজিদ করেন। বৈরাগীরা পুনর্দখল করেন। ১৮৫৩ সালের যুদ্ধে মৌলবী আমীর আলি ও তাঁর জেহাদ-অনুগামীরা মারা যান। [H. R. Nevill ; Barabanki District Gazetteer, Vol. XLVIII-1904 ; Allahabad, p. 169-170]	হনুমানগঢ়ি মন্দির।
১০। রামপুত্র কুশ-নির্মিত বলে কথিত।	ঔরঙ্গজেব-দ্বারা বিধ্বস্ত। হিন্দুরা পুনরায় নাগেশ্বর মহাদেব-মন্দির-রূপে নির্মাণ করেন। [Faizabad Dist. Gazetteer, p. 355.]	স্বর্গদ্বারের নিকটবর্তী মন্দির।

[যুগে-যুগে অযোধ্যার মন্দির, ডঃ গণেশলাল ভার্মার লেখা থেকে সংগৃহীত]

দফার মণিপর্বত সম্বন্ধে বিশ্বকোষ বলেন : 'মণিপর্বত অন্যূন ৪৪ হাত উচ্চ। ইহা ভাঙা ইট ও কাঁকরে পরিপূর্ণ। তাই বোধহয় অট্টালিকার ইট-পাথর-কাঁকর ফেলিয়া এই পর্বত নির্মাণ করা হইয়াছে। এই স্তূপের নিম্নে একবার একখানি ফলক পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে এইরূপ খোদিত ছিল যে, মগধ রাজবংশের নন্দবর্ধন নামক জনৈক রাজা মণিপর্বত নির্মাণ করাইয়াছিলেন।' [বিশ্বকোষ ১, পৃ. ৫১৯]

১০০টি মঠ আর ৫০টি বিশাল প্রধান মন্দিরের এই কয়েকটির হিসাব মিলল। আর বাকিগুলো কোথায়? ফৈজাবাদে!

ইংরেজ-শাসনের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে মোগল-বাদশাহরা দিনে-দিনে নখদন্তহীন হয়ে ক্রমে সর্বস্ব হারাতে থাকেন। তখনও নামমাত্র কয়েকজনের নবাবী থাকলেও ইংরেজের চাহিদা মেটাতে তাঁদের রাজকোষ শূন্য হয়ে যাচ্ছিল। এহেন অবস্থায় সুযোগ বুঝে হনুমানগঢ়ির মোহন্ত উদ্ধব দাস রামজন্মভূমি সম্পূর্ণ উদ্ধারের জন্য, তৎকালীন নবাব ওয়াজেদ আলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন। কয়েকদিন আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে লখনৌতে এ-খবর পৌঁছায়। উপায়ান্তর না দেখে নবাব যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন। যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও বেধে গেল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। শেষ পর্যন্ত অযোধ্যার রাজা মানসিংহের মধ্যস্থতায় নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ এই মর্মে ফরমান জারি করেন যে, 'প্রাচীর-ঘেরা যে-জায়গাটা রয়েছে সেখানে হিন্দুরা মন্দির তৈরি করতে পারবেন এবং সেখানে তাদের পূজাপাঠে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।' এর আগে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও একবার সাধুদের নেতৃত্বে জন্মভূমি অধিকারের চেষ্টা হয়।

এদিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই বছরই (১৮৫৭ খ্রীঃ) প্রথম স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু হয়। সিপাহি-বিদ্রোহের সূচনায় ইংরেজ অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু-মুসলমান নৃপতিগণ একযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রস্তুত হতে থাকে। ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তি হিসেবে অযোধ্যায়ও হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়। তাঁদের নেতৃত্ব দেন অযোধ্যার রাজা মান-সিংহ, আমেঠির আমির আলি এবং বিপ্লবী রামচরণ দাস।

এই সময়েই আমির আলির নেতৃত্বে মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় জন্মভূমি হিন্দুদের হাতে প্রত্যর্পণের প্রস্তাব দেন। আমির আলি ঘোষণা করেন, 'এটি প্রথম থেকেই হিন্দুদের মন্দির।' হিন্দু-মুসলমানের এই মৈত্রীতে ইংরেজ তার চতুরবুদ্ধি প্রয়োগ করে। তা তাঁদের সেই Divide and rule (ভাগ করো এবং শাসন করো) নীতিই—যা এদেশে তাঁদের শাসন সম্ভব করে। ইংরেজ কূটতত্ত্ববিদগণের ভাষায় : 'communalism needs only to be well started and then it thrives of itself; প্রকৃতপক্ষে হলও তাই।

সুলতানপুর গেজেটিয়ারে ৩৬ পৃষ্ঠায় কর্ণেল মার্টিনের এ-বিষয়ে একটি রিপোর্ট : "এই সংবাদে আমাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। সৌভাগ্যক্রমে সিপাহি বিদ্রোহের পাশা পাল্টে গেল—পূর্বাহ্ণেই ইংরেজ-সেনা তৎপর হওয়াতে অযোধ্যার বিষয়টির

সমাধান হয়েছিল ভালোভাবেই। অযোধ্যার রাজা মানসিংহ পলায়িত হন—ধরা পড়েন আমির আলি ও রামচরণ দাস। মন্দিরের সামনেই তাঁদের একটি তেঁতুলগাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হলে ভেঙে গেল বিদ্রোহের মেরুদণ্ড। ফৈজাবাদ জেলার শাসনক্ষমতা আমাদের হাতে রাখতে সক্ষম হলাম।' কিন্তু তার ফলে জনমানসে যে-ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা নির্মূল করতে কত রাউণ্ড গুলি ছোঁড়া হয়, কত অসংখ্য ক্ষতবিক্ষত দেহ সরযূতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, সে-খবর কিন্তু মার্টিনসাহেব জানান নি। কেউই জানায় না; যেমন জানায় নি মুলায়েম সরকার। রাত-দুপুরে হেলিকাপ্টার নামিয়ে নির্বিচারে গুলি।

কিন্তু, মার্টিনসাহেব হিসাব না দিলেও মাইকেল এইচ ফিশার সে-হিসাব দিয়ে গেছেন: 'In order to arrive at a negotiated settlement Nawab Wajid Ali Shah even appointed tripartite investigative commission, consisting of District Officer Agha Ali Khan, the leading Hindu landholder Raja Mansingh and the British Officer-in-charge of the Company's troops in the area. That commission ruled that no Mosque had ever existed on the site. The reason given was that no Mosque could exist so close to a Hindu temple. Unfortunately, the Sunnis did not accept the verdict, and Maulvi Amir Ali led a Jehad, which was effectively repulsed by the Avodh army and nearly all his men numbering about four to five hundred were killed.' [Michael H. Fisher, A Clash of cultures; Avodh, the British and Mughals, p. 230-232.]

৮

ইংরেজ তার সুবিধার্থে রামমন্দির হিন্দুদের হাতে তুলে দিল না। কারণ মন্দির-সমস্যার সমাধান হলে ভারতবর্ষব্যাপী শক্তি হতো একটাই—সে-শক্তি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি। তাই কৌশলে সুন্নি মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করে তারা জটিলতা এনেছে। যাই হোক, রামজন্মভূমির নিকটে ঐক্যচেতনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই তেঁতুল গাছ—অযোধ্যার বুকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম সাক্ষি, হিন্দু-মুসলিম একতার প্রতীক—দুই বিদ্রোহী শহিদের আত্মত্যাগেরও ইতিহাস।

বহু বছর ধরে শহিদদের স্মৃতিতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই জন্মভূমি-সংলগ্ন সেই তেঁতুলগাছটিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে সেই শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন। কিন্তু ইংরেজ সেই গাছটিকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের একতার আশঙ্কায় সমূলে সেটি বিনষ্ট করে।

এদিকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ জাগ্রত রাখতে আমির আলির আদেশ অগ্রাহ্য করে রানী ভিক্টোরিয়ার নির্দেশে মূল জন্মভূমিমন্দির ও রামচবুতরার মধ্যে একটি দেওয়াল তুলে দুই সীমানার মধ্যে একটি দরজা বসানো হয়—যাতে মুসলমানেরা মন্দিরের ভিতর দিয়ে গিয়ে জন্মভূমিতে নামাজ পড়তে পারে। এই বিমাতৃসুলভ ব্যবহারে হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ জাগে। এখন আর মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে। মুসলমানের আত্মতৃপ্তির ভিতরে সুকৌশলে Divide and rule নীতিই প্রযুক্ত হল। অর্থাৎ মন্দির নিয়ে হিন্দু ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করলে মুসলমান যাবে না, মুসলমানদের উপর হিন্দুদের ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা আবার আগের মতোই বেড়ে যাবে—ইংরেজের রাজত্বও অক্ষয় থাকবে।

কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই আবার হিন্দুদের মন্দির দখলের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং একই সঙ্গে আদালতে অভিযোগ করা হয়। রঘুবর দাস -নামে এক মোহন্ত রামজন্মভূমি ফিরে পেতে প্রথম আইনের সাহায্য নেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অযোধ্যার কমিশনারের কাছে এই মর্মে এক আবেদন করেন যে, জন্মভূমির স্থানে এক নতুন মন্দির-স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হোক। অবোধের বিচার-

বিভাগীয় কমিশনার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব।

অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত হল, বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক পর্যন্ত জন্মভূমি সম্পূর্ণ মুসলমানদের দখলে ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল, কোনোদিনই মুসলমানরা রামমন্দির দখলে রাখতে পারেন নি। কোনোদিনও তাঁরা নামাজ পড়তে যান নি—গেছেন শুধু দখলদারি করতে। যতবারই হিন্দু-সম্প্রদায় মন্দিরের গম্বুজ তিনটি ভাঙতে গেছে ততবারই তাঁরা প্রতিরোধ করেছেন—রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছেন হিন্দুরা। এমন প্রমাণ কোথাও নেই যে, মুসলমানরা সেখানে নামাজ পড়তে গেছেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক Dr. Harsh Narin -এর লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি: 'In an application dated Nov. 30, 1858, filed by one Muhammad Asghar Khatib and Muazzin, Babari Masjid, to initiate legal Proceedings against 'Bairagiyan-i-Janmasthan', and the courtyard near the arch and the pulpit within the boundary of the Mosque. 'Maqam Janmasthan Ka', The Bairagis had raised a platform in the courtyard which the applicant wanted to be dismantled. He has mentioned that the place of Janmasthan had been laying unkempt/in disorder for hundreds of years and that the Hindus performed worship there'

উল্লিখিত আবেদনকারীর বক্তব্যেও প্রতীয়মান হয় যে, শতশত বছর (hundreds of years) ধরে ঐ স্থানটি গোলমেলে (unkempt) অবস্থায় পড়ে থেকেছে। হিন্দু-সাধুরা সেখানে একটা মঞ্চ নির্মাণ করে পূজাপাঠ করেছে। দ্বিতীয়ত, আবেদনকারীদের বক্তব্যে আরও পরিষ্কার: ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা বলেছেন, শতশত বৎসর অর্থাৎ প্রথম থেকেই মুসলমানগণ সেখানে অধিকার কায়েম করতে পারেন নি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রঘুবর দাস আইনের দ্বারস্থ হওয়ার আগেই মুসলমানদের পক্ষে মহম্মদ আসগর খাতিব ও মুজাউদ্দিন ঐ আবেদন করেন। চতুর ইংরেজ দু-পক্ষের আবেদনকেই চেপে রাখেন পরবর্তী-সময়ে তাঁদের কাজে লাগাতে। ১৯৩৪ সালের ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৮৫৭ সনের মন্দির-মীমাংসার উদ্‌যোগ ব্রিটিশ চক্রান্তে ব্যর্থ হয়ে গেলে

অযোধ্যার নির্মোহী-আখড়ার সন্ন্যাসীদের পরিচালনায় ১৯১২ সালে আবার সে জন্মভূমি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অসংখ্য আত্মবলির মধ্যে দিয়ে হিন্দুরা এবার তার কতকাংশ সম্পূর্ণ অধিকার করেন। ফৈজাবাদ জেলা-গেজেটিয়ারের ৬২ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে—উল্লেখ আছে দিল্লি-গেজেটিয়ারের ১৭৪ পৃষ্ঠায়।

এই ঘটনার পর হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক একটা দুর্বিষহ তিক্ততায় পরিণত হয়। ইংরেজ ঠিক এই অবস্থাটির জন্য অপেক্ষা করছিল—যাতে তারা জোটবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সামিল না হতে পারে। লখনৌ, ফৈজাবাদ এবং অযোধ্যার সরকারি নথির মতে ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৪ সালে।

ফৈজাবাদের কিছু মুসলমান ব্রিটিশ কমিশনারের কাছে গোহত্যা করার অনুমতি চান। ইংরেজ মনে-মনে আনন্দে নৃত্য করে। ফৈজাবাদ জেলার ডেপুটি-কমিশনার মুসলমানদের শুধু গো-হত্যার অনুমতিই দেন না, কমিশনার নিজেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন। হয়ত এই পরিকল্পিত অগ্নিসংযোগের ফল কতখানি সুদূর-প্রসারিত হয় তা দেখতে! তখন ফৈজাবাদসহ সন্নিহিত এলাকাগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কমিশনারের পক্ষে সে-দাঙ্গা বন্ধ করা সম্ভব হয় না।

মুসলমান-পক্ষ অবলম্বন করে হিন্দুদের উপর ইংরেজ নৃশংস অত্যাচার করে। এই ক্ষোভে হিন্দুরা রামমন্দিরের উপর মীরবাঁকি-নির্মিত স্তম্ভ ভাঙচুর করে। পুলিশের নির্বিচার গুলিতে কয়েকশত মানুষ ঘটনাস্থলেই হতাহত হয়।

এই ঘটনায় ব্রিটিশ-প্রশাসন সচকিত হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সেনা নামানো এবং কার্ফু জারি হয় ফৈজাবাদ ও সন্নিহিত-এলাকায়। বন্দী হয় অসংখ্য হিন্দু-যুবক ও সাধুসন্ত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: জন্মস্থান আখড়ার মোহন্ত রামকিশোর দাস, বড়স্থানের মোহন্ত রঘুবীর প্রসাদ, প্রহ্লাদ হনুমানগঢ়ির মোহন্ত, বাবা রামটহল দাস, বাবা শত্রুঘ্ন দাস, তপস্বী চওয়ানীর প্রমুখ।

প্রশাসনের আদেশে মুসলমানদের জন্মভূমি এলাকায় যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তথাকথিত মসজিদ-সংস্কারের জন্য হিন্দুদের ওপর 'পিটুনী কর' ধার্য হয় পঁচাশি হাজার টাকা। সে-টাকা মন্দিরের উপর নির্মিত গম্বুজ সারাতে মুসলমানদের দিয়ে মহানুভবতা দেখানো হয়। সেইসঙ্গে হিন্দুদেরও মন রাখতে মুসলমানদের উপর জারি হয় কিছু নিষেধাজ্ঞা—অযোধ্যার দশ মাইলের মধ্যে কোনো মসজিদ স্থাপন করা যাবে না, করা যাবে না কবরখানাও। সেই সঙ্গে

এই দশ মাইলের মধ্যে গো-হত্যাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। মুসলমানদের মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ হল---অথচ সেখানে নামাজ পড়তে বাধা রইল না। অদ্ভুত!

অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল এবং জাতিগতভাবে ভারত দু-ভাগ হল। হিন্দুদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, তাঁদের দেশমাতাকে মা বলা অপরাধ—আর মুসলমানের দুইই রইল। পাকিস্তানে গুরুদুয়ারা ভেঙে মসজিদ হল, কিন্তু এদেশে মন্দিরের-ওপর-গম্বুজ-চাপানো মসজিদের দাবি গেল না। এদেশের ইংরেজ -অনুগৃহীত শাসন-কর্তাদেরও সেই divide and rule -নীতির উত্তরাধিকার রইল।

যাই হোক, স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে রামজন্মভূমিতে শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যমূর্তির আবির্ভাব (মতান্তরে প্রতিষ্ঠা) ঘটল। মূল রামমন্দিরের ভিতর বেদিস্থানে বা গর্ভগৃহে নতুন মূর্তি-প্রতিষ্ঠার সংবাদে দূরদূরান্তের অগণিত ভক্তের আগমন ঘটতে থাকল। অযোধ্যার শরীরে লাগল আবেগের ছোঁয়া। পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত এই নগরী নররক্তে সিক্ত হতে-হতে শেষে পাষাণী অহল্যার মতো অগণিত শ্রীরামভক্তের পদপাতে আবার যেন নবজীবন লাভ করল।

হিন্দুগণ আবার রামজন্মভূমিকে পূর্ণ সংস্কার করে পবিত্র হিন্দুতীর্থে পরিণত করতে প্রয়াসী হল। আর তখন থেকেই শুরু হল চূড়ান্ত আইনের লড়াই। এতদিন মন্দির -সম্বন্ধে প্রায় বিস্মৃত মুসলমানগণ প্রতিবাদ জানালেন প্রশাসনের কাছে। সেখানে নমাজ পড়বার অধিকারও চাইলেন। তখন ফৈজাবাদের জেলা-শাসক ছিলেন শ্রী কে. কে. নায়ার।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ অনুসারে: ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক মহম্মদ আসগর খাতিব ও মুজাউদ্দিন নামক দুই ব্যক্তি জন্মভূমির মন্দির ভেঙে সত্যকারের একটি মসজিদ বানাতে চেয়েছিলেন। তার উত্তরে তৎকালীন প্রশাসন তাঁদের কি বলেন তা আমাদের জানা নেই। মনে হয়, মন্দির ভাঙার অনুমতি দেন নি। তার পরের মামলা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে—বাদী রঘুবর দাস বনাম সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া ইন কাউন্সিল। মোকদ্দমা নং ৬১।২৮০, তারিখ ২৪. ১২. ১৮৮৫। সে মামলায় রঘুবর দাস রামচবুতরায় একটি পৃথক মন্দির স্থাপন করতে চাইলে তৎকালীন ফৈজাবাদের সাব-জজ তাঁর রায়ে বলেন: 'In between the Mosque and the chabutra, there is a···boundary wall, built by the Govt. before the recent dispute. Before this Hindus and Muslims both used to offer prayers and worship at the place. In 1855, after the fight amongst Hindus and Muslims, a

boundary wall was constructed to avoid future disputes, so that the Muslims should worship inside that wall and Hindus should worship outside that wall, hence the chabutra and the land which is situated outside the boundary-wall belong to Hindus and the plaintiff.'। সেই আদেশে তিনি আবেদনকারীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করার যুক্তি দেখান এই : 'The prayer for permission to construct the temple is at such a place where there is only one passage for the temple as well as for the Mosque. The place where the Hindus worship is in their possession from old and their ownership cannot be questioned····· if a Temple is constructed at such a place, then there will be sound of bells and 'Sankha', when both Hindus and Muslims pass from the same way and if permission is given to Hindus for constructing temple, then one day or the other a criminal case will be started and thousands of people will be killed. For this reason of breach of law and order the officers have restrained the parties from making any new construction···So this court also considers that awarding permission to construct the temple at this juncture is to lay the foundation of riot and Murder···between Hindus and Muslims···the reliefs clamied should not be granted' (—অর্থাৎ, মসজিদ এবং চবুতরার মধ্যে একটি দেওয়াল আছে। যেটি ১৮৫৫ সালের সাম্প্রদায়িক বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই তৈরি করা হয়েছে—যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ বিবাদ এড়িয়ে চলা যায়। ইতোপূর্বে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সেখানে প্রার্থনা করতেন। সেই বিবাদের পর থেকে সংঘাত এড়িয়ে চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হিন্দু প্রাচীরের বাইরে এবং মুসলমান প্রাচীরের ভিতরে প্রার্থনা করবেন। অতএব চবুতরাসহ সীমানা-প্রাচীরের বাইরের সন্নিহিত ভূমি হিন্দুদের ও বাদীর অধিকারে রয়েছে। কিন্তু বাদী এমন একটি জায়গায় মন্দির তৈরির প্রার্থনা করেছেন যেখানে সেই মন্দির ও মসজিদে প্রবেশের একটিমাত্র রাস্তা। বহুকাল পূর্ব থেকে পূজাস্থান হিন্দুদের অধিকারে আছে, সে জন্য হিন্দুদের স্বত্বস্বামিত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই তোলা যায় না। কিন্তু

উক্ত স্থানে মন্দির তৈরি হলে, সেখানে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ হবে। যখন একই রাস্তা দিয়ে উভয় পক্ষকেই যেতে হবে, তখন যদি হিন্দুদের মন্দির তৈরি করতে অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে যে-কোনো দিনই ফৌজদারি মামলা শুরু হয়ে যাবে এবং সহস্র লোক প্রাণ হারাবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই নিয়োজিত অফিসাররা নতুন-কোনো মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেন নি। অতএব এই আদালত মনে করেন যে, এই অবস্থায় মন্দির তৈরির অনুমতি দেওয়ার অর্থই হল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ও হত্যার ভিত্তি স্থাপন করা। অতএব এক্ষেত্রে প্রার্থিত প্রতিকার দেওয়া যেতে পারে না)।

কিন্তু ইতিপূর্বে ১৮৫৫ সালের আসগর খাতিব ও মুজাউদ্দিনের আবেদন থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্থানটি ঐ অবস্থাতেই শতশত বৎসর পড়ে ছিল। আবার ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ওয়াজেদ আলি খানের পৌরোহিত্যে ত্রৈপাক্ষিক বৈঠকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, ঐ স্থানটি আদৌ মসজিদ নয়। ওটা মন্দির—চিরকালই মন্দির। আলমগীরনামা থেকে বিধান দেখিয়েই উক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই কারণেই সে-স্থানটি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের হাতেই তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এতৎসত্ত্বেও মাননীয় বিচারপতি শাঁখ-ঘণ্টার আওয়াজের অজুহাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখলেন।

যাই হোক, অতঃপর রামমন্দিব-বিষয়ক যতগুলি মোকদ্দমা হয়েছে তা এই বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর যুগ থেকে। ১৯৪৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে যার সূত্রপাত, আজও চলেছে তা। এ পর্যন্ত একটি মামলাও নিষ্পত্তি তো দূরের কথা, শুনানিও হয় নি। হয় নি সাক্ষ্যসাবুদদের জবানবন্দী। আর সেইজন্যই গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রী জি. এম. লোধা আক্ষেপ করে বলেন, 'চল্লিশ বছর আগে ১৯৫০ সালে রামজন্মভূমি নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। আজ পর্যন্ত তার কোনো শুনানি বা কোনো সাক্ষির জবানবন্দী নেওয়া হয় নি। এজন্মে কি আর মীমাংসা হবে? মনে হয় অসম্ভব।'

সত্যই অসম্ভব। আইন যদি তার নিজের রাস্তা-মতো চলতে পেত, তা হলে কবে এর মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু আইনকে সামনে খাড়া রেখে তার পশ্চাতে চলেছে রাজনীতির নিত্যনতুন খেলা। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে বসিয়ে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। এদেশের আইন আজ ধৃতরাষ্ট্রের সিংহাসনে অথর্ব বৃদ্ধ। এ-খেলা ভাল লাগে নি বলে সরে গেছেন অনেকে—যেমন, কে. কে. নায়ার, শ্রীগুরুদত্ত সিং প্রমুখ!

৯

রামজন্মভূমি বাবরি-মসজিদ বিতর্ক-সংক্রান্ত সবশুদ্ধ পাঁচটি মামলা এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে। এর ভিতর দুটি মামলা ১৯৫০ সালে এবং একটি ১৯৫৯ সালে দাখিল হয়। এটি উত্তরপ্রদেশ সুন্নি সেণ্ট্রাল বোর্ড অব্ ওয়াকফ্ এবং কতিপয় সুন্নি মুসলিমের পক্ষ থেকে (কোড অব্ সিভিল প্রসিডিওর অর্ডার ১ রুল ৮ অনুযায়ী) ভারতের সাধারণ মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বমূলক স্যুট-রূপে রুজু করা হয়। সর্বশেষ মামলাটি হল ১৯৮৯ সালের ২৩৬ নং মোকদ্দমা—বাদীপক্ষে শ্রীরামজন্মভূমিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিরাজমান বিগ্রহসমুদয় এবং বিবাদী পক্ষে পূর্ববর্তী মামলাগুলির সমস্ত পার্টি ও শিয়া সম্প্রদায়।

প্রথম মামলাটির ইতিহাস এইরূপ। ১৯৪৭ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর রাত্রে শ্রীরামজন্মভূমির মন্দিরে ভগবান 'শ্রীরামলালা' বিগ্রহরূপে প্রকট হন। কর্তব্যরত হাবিলদার আবদুল বরকত মুসলমান হলেও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ করলেন। বরকত সাহেবের দেওয়া বিবৃতি-অনুসারে ঘটনাটি এই প্রকার :

আবদুল বরকত কর্তব্যরত অবস্থায় রাত্রি প্রায় দুই-ঘটিকায় বিতর্কিত মসজিদের মধ্য থেকে একটা তীব্র আলোর ঝলক দেখতে পান। আরও দেখেন, সোনলি রঙের সেই তীব্র আলোর মধ্যে ৪।৫ বছরের একটি দিব্য শিশু (রামচন্দ্রের বাল্যমূর্তি ?)। তিনি তাঁর জীবনে এমন ঘটনা আর প্রত্যক্ষ করেন নি। এই দৃশ্য দেখে তিনি জ্ঞান হারান। পরে চেতনা লাভ করে দেখেন, প্রবেশদ্বারের তালা খোলা—অসংখ্য হিন্দুজনগণ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে সিংহাসনস্থিত সেই শিশুবিগ্রহকে আরতি করছেন।

বরকত সাহেব কি স্বপ্ন দেখেছিলেন! তাই যদি হয়, স্বপ্নভঙ্গের পরে তা বাস্তবায়িত দেখেন কি করে? বিষয়টা গোয়েন্দা-বিভাগের।

পরের দিন অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর অযোধ্যা থানার বড়ো দারোগা এক এফ. আই. আর -এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন এইভাবে : 'বিশাল হিন্দুজনতা বাবরি মসজিদের মধ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু যথেষ্ট পুলিশি ব্যবস্থা থাকায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি।' অতঃপর তিনি ১৯৪৯ সালের

২৯ ডিসেম্বর ফৌজদারি-কার্যবিধি আইনের ১৪৫ ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করেন—যাকে বলে 'সুয়ো মোটো' মোকর্দ্দমা'। এই মোকদ্দমায় সরাসরি কোনো পক্ষ বাদী বা বিবাদী-রূপে রইল না। শুধু উল্লেখ করা হল: 'Between Hindus and Muslims in Ayodhya'। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন অযোধ্যা ও ফৈজাবাদের অতিরিক্ত জেলাশাসক কে. কে. নায়ার এক নির্দেশে (যেহেতু তাঁর মতে: 'The case being one of emergency···The building claimed variously as Babri Masjid and JanmaBhoomi Mondir') সেই স্থানটিকে বিতর্কিত ঘোষণা করে, সৌধসহ সন্নিহিত এলাকা অধিগ্রহণ করেন এবং তৎকালীন অযোধ্যার মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রিয়দত্ত রামকে রিসিভার নিযুক্ত করেন।

প্রিয়দত্ত রাম এই দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৫০ সনের ৫ জানুয়ারি ফৈজাবাদের জেলা-শাসককে এক চিঠিতে জানান: ব্যবস্থা তিনি করেছেন 'for the unkeep of the worship of the Idol installed inside the said building. However the continued existence of the Idol inside the building and his worship therein, having been threatened by agnostics and non-believers.' (অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানটিকে তিনি অধিগ্রহণ করেছেন। সেই সৌধের মধ্যে পূজার ব্যবস্থা করে তার যথাযথ তদারকিও করছেন। কিন্তু রামবিগ্রহের সেই সৌধ-মধ্যে অবস্থান এবং নিয়মিত পূজাপাঠ চলতে থাকায় অবিশ্বাসী -নাস্তিকরা ভীতি-প্রদর্শন করে চলেছে।)

এদিকে জন্মভূমিতে 'রামলালা'-বিগ্রহ প্রকট হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সুন্নি-মুসলমান সম্প্রদায় যথারীতি সে-স্থান থেকে মূর্তি সরিয়ে দেবার দাবি জানাতে থাকেন। তাঁরা প্রথম থেকেই আইনের পথে না গিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের শরণাপন্ন হন। যাঁরা এতদিন জন্মভূমি-মসজিদের ত্রিসীমানায় আসেন নি, এই ঘটনার পর সেখানে নামাজ পড়ার জন্য তাঁরা আগ্রহী হন। এদিকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের হুমকিতে ভয় পেয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে নির্দেশ দিলেন জন্মভূমি থেকে মূর্তিগুলি হাটিয়ে দিতে। কারণ ভারতবর্ষ যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র! এদিকে বোম্বে উইকলিতে বাবরি সাহাবুদ্দিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'After the British left, Muslims should have ruled, not Hindus. Increased

number of Muslim population helped in snatching away a large chunk of India, and create Pakistan. Muslims (of India) should continue to work to convert the rest of India to Pakistan.' [Bombay Weekly, Jan 1983.] (অর্থাৎ, ব্রিটিশরাজ এদেশ ছাড়ার পর, হিন্দু নয়, মুসলমানদেরই এদেশে শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। এখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, এবং হিন্দুদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে তাদের হক—ভারতবর্ষ-শাসনের অধিকার। মুসলমানদের ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ এদেশের সমস্তটুকু পাকিস্তানে রূপান্তরিত না হয়।)

যাই হোক, জওহরলাল নেহরু এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থের নির্দেশে মূর্তিগুলিকে সেখান থেকে অপসারণের জন্য প্রশাসনের ওপর অত্যধিক চাপ আসে। এই চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে শ্রী কে. কে. নায়ার পদত্যাগ করেন। আর ঠিক সে-সময়ই দ্বিতীয় মামলা দায়ের করা হয়।

দ্বিতীয় মামলার ইতিহাস এইরূপ। ১৯৫০ সালের ১৬ জানুয়ারি ফৈজাবাদের সিভিল জজের আদালতে দ্বিতীয় মোকদ্দমা দায়ের করেন গোপাল সিং বিশারদ-নামে একজন আইনজীবী। তিনি মামলায় ইনজাংশনের প্রার্থনা ও একই সঙ্গে এই মর্মে ঘোষণা প্রার্থনা করেন যে, 'উপরিউক্ত সৌধ থেকে শ্রীরামবিগ্রহসহ অন্যান্য বিগ্রহ সরানো চলবে না। পূজা ও দর্শনে বাধা-সৃষ্টি করার জন্য প্রবেশপথ বন্ধ করা চলবে না। রামজন্মভূমিতে বাদীর ভগবান রামবিগ্রহপূজা ও দর্শনের অবাধ অধিকার ঘোষণা করতে হবে এবং বাদীর এই অধিকারে বিবাদীর বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার থাকবে না।' এই মামলায় বিবাদীগণ হলেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার, ডেপুটি-কমিশনার, সিটি-ম্যাজিস্ট্রেট, ফৈজাবাদের পুলিশ-সুপারিনটেনডেণ্ট এবং আরও ৫ জন মুসলমান। এই আবেদনের ভিত্তিতে তৎকালীন ফৈজাবাদের সিভিল-জজ বিবাদীগণের উপর নোটিশের আদেশ এবং বাদীর প্রার্থনানুসারে সঙ্গে-সঙ্গে অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার (ইনজাংশন) আদেশ দেন।

১৯. ১. ১৯৫০ সনের ফৈজাবাদের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের এক আবেদনের ভিত্তিতে সিভিল-জজ পূর্বোক্ত আদেশ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'The parties are hereby restrained by means of temporary injunction to refrain from removing the Idol in question from the site in dispute and from enterfering with puja etc. as at present

carried on.' (অর্থাৎ পক্ষগণ যেন বিতর্কিত স্থান থেকে আলোচ্য দেববিগ্রহগুলিকে সরিয়ে ফেলা থেকে বিরত থাকেন এবং পূজা ও দর্শনে কোনোরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেন। যেভাবে পূজাপাঠ চলছে, সেভাবেই চলবে।)

কিন্তু ফৈজাবাদের সিভিল-জজ জেলা-প্রশাসনের অনুরোধে, শান্তিভঙ্গের কারণ দেখিয়ে বিচারক বীরসিংহ এই রায়দানের পরেও, অতিরিক্ত এক রায়ে বলেন : মন্দিরে পূজাপাঠ চলবে—কিন্তু শুধুমাত্র পুরোহিতেরাই মন্দিরে যেতে পারবেন। এতৎসত্ত্বেও দিল্লি প্রশাসন অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে রামমন্দিরের মূল দরজায় একটি তালা লাগিয়ে দেন। এরপর ৩ মার্চ ১৯৫১ তারিখে সকল পক্ষের বক্তব্য শুনে সিভিল-জজ আদেশ দেন : 'The order to remain in force until the suit is disposed of. (অর্থাৎ যে-পর্যন্ত না এই মামলার নিষ্পত্তি হয়, ততক্ষণ উক্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে)।

এই আদেশের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হাইকোর্টে আপিল করলে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দুই মহামান্য বিচারপতি (প্রধান বিচারপতি ডি. মুথাম ও বিচারপতি রঘুবীর দয়াল) ২৬. ৪. ১৯৫৫ তারিখের এক আদেশে পূর্বোক্ত সিভিল জজের আদেশ সমর্থন ও অনুমোদন করেন। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালে সিটি-ম্যাজিস্ট্রেট পূর্বোক্ত ১৪৫ ধারার মামলাটি (যেটি সর্বপ্রথম পুলিশ বনাম জেলা প্রশাসনের মামলা) বন্ধ করে দেন। যেহেতু সিভিল কোর্টের নিষেধাজ্ঞার (ইনজাংশনের) ফলে শান্তিভঙ্গের কোনো আশঙ্কা নেই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি মোকদ্দমার কথা উল্লেখ করতে হয়। অযোধ্যার দিগম্বরী আখড়ার মোহন্ত পরমহংস রামচন্দ্র দাস ১৯৫০ সনের ২ নং মামলার মতো (আইনজীবী গোপাল সিং বিশারদ যে মামলা দায়ের করে ইনজাংশন দাবি করেন) আরও একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারকে ৮০ ধারা অনুযায়ী নোটিশ দেন। উক্ত মামলাটি হল ১৯৫০ সনের ২৫ নং মোকদ্দমা। এই মামলাটির বিষয়বস্তু উল্লিখিত ১৯৫০-এর দ্বিতীয় মামলার মতো—তাই এই মামলাটি উক্ত মামলাটির সঙ্গে সামিল হয়। যাই হোক, আজ পর্যন্ত উল্লিখিত মামলার কোনো শুনানি বা সাক্ষ্যগ্রহণ হয় নি।

অতঃপর তৃতীয় মামলাটি এইরূপ। এই মামলা দায়ের করেন অযোধ্যার নির্মোহী আখড়া। সেটি ১৯৫৯ সালের ২৬ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা। এই মামলায় বাদীপক্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানান পূর্বোক্ত রিসিভার বাতিল করে দিয়ে রামজন্মভূমি মন্দির তাঁদের দখলে দিতে।

এই মামলাটিরও কোনো শুনানি এখনো হয় নি। উল্লিখিত সবকটি মামলাই ফৈজাবাদের অতিরিক্ত জেলা-জজের আদালতে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। অতঃপর চতুর্থ মামলাটি দাখিল হয় ১৯৬১ সালের ১৮ ডিসেম্বর। এটি ১৯৬১ সালের ১২ নম্বর মামলা। এই মামলার রায়ের উপরেই আইনের যুদ্ধের পরিণতি নির্ভর করছে। কারণ, এই মোকদ্দমাটিই বর্তমানে প্রধান মামলায় পরিণত হয়েছে। ১৯৪৯ সনের ২৩ ডিসেম্বরের পর, মুসলমানদের তরফে এ-পর্যন্ত আর-কোনো মামলা দায়ের করা হয় নি। ১৯৬১ সনের ১৮ ডিসেম্বর ১২ নং মোকদ্দমাটিই হল তাঁদের তরফে প্রথম।

এই মামলায় বাদী সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড এবং আরও ৯ জন মুসলমান। কিন্তু তাঁদের কেউই মাতোয়ালি নন। প্রতিনিধিত্বমূলক ভাবে 'সমগ্র মুসলিম-সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করার জন্যই' যেন এই মামলা দাখিল করা হয়েছে। এই মামলায় বিবাদীরা হলেন: (১) গোপাল সিং বিশারদ, (২) পরমহংস শ্রীরামচন্দ্র দাস, (৩) নির্মোহী আখড়া, (৪) নির্মোহী আখড়ার মোহন্ত রঘুনাথ দাস, (৫) উত্তরপ্রদেশ সরকার, (৬) ফৈজাবাদের কালেক্টর, (৭) ফৈজাবাদের সিটি ম্যাজিস্ট্রেট, (৮) ফৈজাবাদের পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট, (৯) প্রিয়দত্ত রাম (রিসিভার রামজন্মভূমি) ও অন্যান্য কয়েকজন। কিন্তু এই মোকদ্দমায় মন্দির-মধ্যস্থিত মূর্তিগুলি, অর্থাৎ রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন-প্রভৃতি বিগ্রহগুলিকে বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত করা হয় নি।

১৯৬১ সালের এই ১২নং মামলার আর্জিতে প্রার্থনা করা হয়েছে: (১) AB-CD-চিহ্নিত ভূমিটিতে অবস্থিত সৌধকে একটি মসজিদ বলে ঘোষণা করা হোক, (যা সাধারণভাবে বাবরি-মসজিদ নামে দাবি করা হয়) এবং EFGH চিহ্নিত ভূমিটি যা 'গঞ্জশহীদান'-নামে পরিচিত, তাকে মুসলমানদের কবরস্থান বলে ঘোষণা করা হোক। (২) মসজিদে অবস্থিত হিন্দুদের দেববিগ্রহ ও অন্যান্য পূজার জিনিসপত্র অপসারিত করে, মুসলমানদের হাতে ঐ মসজিদ ও কবরস্থানের দখল দেওয়া হোক।

এই মোকদ্দমার আর্জিতে বলা হয়েছে: 'The cause of action against the Hindu Public arose on 23.12.1949, when the Hindus unlawfully and illegally entered the Mosque and desecrated the Mosque by placing Idols in the Mosque, thus causing obstruction and interference with the right of the Muslims

in general, of saying prayers and performing other religious ceremonies in the Mosque. The Hindus are also causing obstructions to the Muslims going to the 'grave-yard' and reciting Fatiha to the dead persons buried therein' (অর্থাৎ গত ২৩।১২।৪৯ তারিখে হিন্দুজনগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করার কারণ ঘটেছে, যেদিন হিন্দুরা অবৈধভাবে মসজিদ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এইভাবে মসজিদের ভিতর মুসলমানদের প্রার্থনা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার অধিকারে হস্তক্ষেপ ও বাধা-সৃষ্টি করা হয়েছে। হিন্দুরা মুসলমানদের কবরস্থানে যেতে বাধা দিচ্ছে। কবরস্থ মৃতদেহের উপর 'ফতিহা'-পাঠে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে তারা ক্রমাগত ও অবিরত প্রতিদিন ক্ষতি করে চলেছে। ২৯।১২।৪৯ তারিখেও মামলার কারণ উদ্ভব হয়েছে, কারণ ঐ তারিখের আদেশ-অনুসারে রিসিভার প্রিয়দত্ত রামকে ৫।১।১৯৫০ তারিখে মসজিদের দখল দেওয়া হয়েছে।)

কিন্তু এই মামলাটি যে চলতে পারে না, সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন আইন-বিশেষজ্ঞ কতকগুলি যুক্তি দেখিয়েছেন। যেমন,

(১) মামলাটি তামাদি-দোষে দুষ্ট। এই একমাত্র কারণেই উক্ত মোকদ্দমাটি খারিজ হয়ে যাওয়ার যোগ্য। তামাদি হওয়ার কারণে মসজিদের দখলের দাবিটিও নাকচ হয়ে যায়।

(২) ওয়াবফের সুন্নি-সেন্ট্রালবোর্ড অথবা অন্য-কোনো বাদীর এই মামলা দায়ের করার কোনো অধিকার নেই।

(৩) গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী জি. এম. লোধা, হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শিবনাথ কাট্‌জু, দেওকিনন্দন, গোপীনাথ, প্রখ্যাত আইনবিদ রামেশ্বরপ্রসাদ গোয়েল, রামশঙ্কর দ্বিবেদী, কেশরিনারায়ণ ত্রিপাঠী, ভি. কে. এস. চৌধুরি এবং আইনের শেষকথা বলার অধিকারী ভারতের প্রাক্তন এটর্নি-জেনারেল শ্রী লালনারায়ণ সিংহের মতে: 'হিন্দু-আইন অনুসারে দেববিগ্রহও জনৈক ব্যক্তি—আইনের ভাষায় Juristic Person। ১৯৬১ সালের ১২ নং মোকদ্দমায় সেই দেববিগ্রহের বিরুদ্ধেই মূলত মামলা দায়ের করা হয়েছে তাঁকে উচ্ছেদ করার জন্য—কিন্তু তাঁকেই বিবাদী-পক্ষভুক্ত করা হয় নি। অন্যদিকে মসজিদের মতোয়ালিকেও বাদী-রূপে পক্ষ করা হয় নি।

(৪) আগেই বলা হয়েছে, হিন্দু-দেবতা হচ্ছেন Juristic Person;

সেখানে তিনি বাস করেন সেটিই তাঁর মন্দির। পৃথিবীতে এমন-কোনো আইন নেই যার জোরে তাঁকে তাঁর গৃহ থেকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। সর্বোপরি যেহেতু রামবিগ্রহকে বিবাদীরূপে মামলায় পক্ষভুক্ত করা হয় নি, সেই-কারণে তিনি কোর্টের আদেশ মানতে বাধ্য নন। কারণ যার বিরুদ্ধে মামলা তাঁকেই নোটিশ করা হয় নি—সুতরাং তিনি এই মামলার কিছুই জানেন না এবং তাঁর বক্তব্যও জানাতে পারেন নি। সুতরাং কোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে রায় দেবেন কি ভাবে ?

(৫) ১৯৪৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে গেজেট-বিজ্ঞপ্তির ১৭ নং ইস্যুর ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশের ওয়াকফ সুন্নি সেণ্ট্রাল বোর্ডকে বাবরি মসজিদের ওয়াকফ দেখাশুনার ক্ষমতা দিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, তা আইনানুগ নয়। সুপ্রিম কোর্টের গুলাম আব্বাস বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার মামলায় (AIR 1981 see 2198) পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, উক্ত নোটিশটির Doubtful validity and probative value। মামলায় অন্যান্য মক্কেলগণ নিজেদের পূজকরূপে দাবি করায় প্রিভি-কাউন্সিল তাদের দাবি নস্যাৎ করে দেন (শহীদগঞ্জ মসজিদ কেস, এ. আই. আর ১৯৪০ পি. সি. ১১৬) এই মর্মে যে, মুসলমান পূজকগণ বড় জোর তাদের ক্ষমতা মতোয়ালিকে অর্পণ করতে পারেন। (১৯১৫ সালের এ. আই. আর ম্যাড ৬৮৭) মাদ্রাজ হাইকোর্টও অনুরূপ একটি মামলায় মুসলমান পূজকদের মসজিদের মালিকানা-স্বত্ব দেওয়ার বিপক্ষে রায় দেন।

উক্ত আইন বিশারদগণ আরও একটি পুরানো কেস-ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রানী ছত্রকুমারী দেবী বনাম মোহন বিক্রমশাহ (AIR 1931/ P.C. 196) মামলায় প্রিভি কাউন্সিল বলেন যে, ট্রাষ্ট-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য উপভোক্তার মামলা ভারতীয় লিমিটেশন আইনের ১২০ ধারা অনুসারে হবে। উক্ত ধারামতে ৬ বছরের মাত্র লিমিটেশন হতে পারে। কিন্তু তা কিছুতেই উক্ত আইনের (১৪২ বা ১৪৪ ধারার ১২ বছরের লিমিটেশন) মতো হতে পারে না।

(৬) উক্ত মামলার আর্জিতে জমির আয়তন সম্পর্কে কোনো কথা নেই। এই ত্রুটি দূর করার জন্য সিভিল-প্রসিডিওর রুল ৩ অর্ডার ৭-বলে সেই আর্জিপত্র সংশোধন করে তাতে প্লট-নম্বর বসানো হয়। এক্ষেত্রেও সেটেল্‌মেণ্ট বা সার্ভের কোনো রেকর্ড নেই। এমন কি আর্জিতে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনো সীমানাও দেওয়া হয় নি। যদিও মামলায় উল্লিখিত অট্টালিকার অবস্থান ও পরিচিতি সম্পর্কে কোনো বিবাদ নেই, তথাপি আর্জিযুক্ত মানচিত্রে EFGH চিহ্নিত

যে কবরস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে, তার অবস্থান ও সীমা নির্ধারণ করা অসম্ভব। অর্থাৎ মামলায় উল্লিখিত অট্টালিকার সংলগ্ন কোনো কবরস্থান ছিল না।

আরও একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। ১৯৬১ সালের ১৮ ডিসেম্বর ১২নং মামলাটি সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের তরফ থেকে করা হলেও, প্রায় বারোজনের বেশি স্থানীয় মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে শপথ গ্রহণ করে এক হলফনামায় বলেন, 'তাঁদের ধারণা অনুযায়ী বিতর্কিত স্থানটি মসজিদ নয় এবং মুসলমানেরা কোনোদিনই সেই স্থান উপাসনাস্থল-রূপে ব্যবহার করেন নি।' বাদী ওয়াকফ বোর্ডের ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ১৯৪৯ এর ২০-২৩ ডিসেম্বরের ঘটনা সম্বন্ধে এক রিপোর্টে বলেন : ঐ স্থানে মাসাধিককাল রাম-নাম জপ-কীর্তন-ইত্যাদি চলছে।'

এই-প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন এটর্নি-জেনারেল শ্রীলালনারায়ণ সিংহের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে 'মুসলমান ওয়াকফ আইন ১৯২৩ সালে বলবৎ হয়। এটি কেন্দ্রীয় আইন। এর পরে আসে ইউ. পি. মুসলিম ওয়াকফ্স্ এ্যাক্ট ১৯৩৬। এর ফলে সুন্নি ও শিয়া ওয়াকফ্ বোর্ড গঠিত হয়। সুতরাং উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে ওয়াকফ সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাবপত্র রাখার ব্যবস্থা ১৯২৩ সালেই বলবৎ করা হয়েছিল। কিন্তু এই বিতর্কিত স্থানটি সম্বন্ধে সেই অনুযায়ী কোনোরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, এমন কোনো প্রমাণ নেই।' এই সঙ্গে মাননীয় শ্রী সিংহ আরও বলেন, 'লক্ষ্য করার মত বিষয় হল, যে-বিতর্কিত অংশকে জন্মস্থান মসজিদ বা মসজিদ জন্মস্থান বলে, অথবা শুধুই জন্মস্থান বলে, তার মৌজা রেভিনিউ রেকর্ডে এবং অন্যান্য দলিলে 'রামকোট' বা 'কোট অব রামচন্দ্র' -নামে উল্লিখিত আছে এবং তাতে মুসলমানদেরও স্বাক্ষর আছে।'

সর্বোপরি ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত প্রায় ৪১ বছর হল বিগ্রহগুলি ওখানে অবস্থান করছেন। যেহেতু হিন্দু-আইনে বিগ্রহ Juristic Person, সেই কারণে তাঁদের সেখানে দখলিস্বত্ব কায়েম হয়ে গেছে। এমনিতেই বারো-বছরের বেশি হয়ে গেলে, দখলস্বত্ব-অনুসারে দখলদারই মালিকানা-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এ কারণেও সেইস্থান সম্বন্ধে মসজিদের কোনো দাবিই গ্রাহ্য নয়।

তাহলে এ-পর্যন্ত আইনের নিরিখে যা দেখা গেল তা এই :

১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর 'রামলালা' বিগ্রহ মন্দিরে প্রকট হলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ১৪৫ ধারা-মতে 'সুয়োমটো' মোকদ্দমা রুজু করে। তার উত্তরে তৎকালীন জেলা-শাসক কে. কে. নায়ার সেই স্থানটিকে বিতর্কিত ঘোষণা

করে অধিগ্রহণের আদেশ দিলেন। সেই আদেশ অনুসারে তৎকালীন অযোধ্যার মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রিয়দত্ত রাম রিসিভার নিযুক্ত হলেন। তিনি ঐ মন্দিরের অধিগ্রহণের দায়িত্ব নিয়ে বিগ্রহের পূজার্চনার জন্য চারজন পুরোহিত নিয়োগ করলেন—যাঁরা এখনও সরকারি-বেতনে পূজা করে চলেছেন।

মুসলমানরা এই অবস্থায় মূর্তি-অপসারণের দাবি জানান। প্রশাসনের উপর দিল্লি থেকে চাপ এল মূর্তি সরানোর। কিন্তু কে. কে. নায়ার সে দাবি মানতে পারলেন না; শেষে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে পদত্যাগ করলেন। এদিকে মুসলমান (সুন্নি মুসলমানরাই একমাত্র)-সম্প্রদায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে দিল্লিতে দরবার শুরু করলেন। জহরলাল চাপ সৃষ্টি করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থকে তালাচাবি লাগাতে। দিল্লির নির্দেশ কার্যকরী করতে তৎপর হলেন গোবিন্দবল্লভ। প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন সিটি-ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীগুরুদত্ত সিং।

এদিকে তখনই গোপাল সিং বিশারদ মূর্তি না-সরানোর জন্য ইনজাংশন চাইলেন আদালতে। সিভিল-জজ বীর সিং ইনজাংশন মঞ্জুর করে বললেন, পুরোহিত ছাড়া মন্দিরে সাধারণ দর্শনার্থী যেতে পারবেন না। মুসলিমরাও আসতে পারবেন না ঐ মন্দিরের ২০০ গজের মধ্যে। তৎপরে অতিরিক্ত সাবধানী প্রশাসন সেখানে মূল দরজায় একটি তালা লাগিয়ে দেন।

ইতিমধ্যে আরও একটি মামলা হল। যেটি ৮০ ধারা অনুযায়ী ১৯৫০।২ নম্বর মামলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। এদিকে অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা-মামলা নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত ঐ আদেশ বহাল রইল। অন্যদিকে ১৯৬১ সালে মুসলমানদের প্রতিনিধি-রূপে মামলা আনা হয়। পরবর্তীকালে আরও দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে—একটি ১৯৮৬, অন্যটি ১৯৮৯ সালে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে আসার আগে একবার সাধু-সম্প্রদায়ের প্রস্তুতি দেখা যাক।

১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির দখলের কাল থেকে আজ পর্যন্ত জন্মভূমি ফিরে পেতে যতগুলি অভিযান হয়েছে, চিরদিন তার পুরোভাগে থেকেছেন ভারতের সাধুসন্ন্যাসীর দল। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন দেশের সমস্ত হিন্দু-রাজা ও আপামর জনসাধারণ। হংসবর রাজ্যের মহান রানী জয়কুমারীও তাঁর নারীবাহিনী এসেছেন সন্ন্যাসী মহেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে। এসেছেন শিখ ধর্মগুরু শিখসৈন্যবাহিনী নিয়ে। অযোধ্যার আখড়ার মোহন্তগণ বারংবার হাসিমুখে এসেছেন জীবন বলি দিয়ে এই ধর্মস্থানটিকে উদ্ধার করতে। যুগযুগান্ত লড়াই

করেই চলেছেন। কখনও মীর বাঁকি, কখনও হুমায়ুন, কখনও আকবর, ঔরঙ্গজীব— এই ক'দিন আগেও মুলায়েমের সরকার নৃশংস হত্যা করেছেন। পরমবীর সিং এবং জি. এস. ভল্লার গুলিতে প্রকাশ্য দিবালোকে সকাল দশটা কুড়ি মিনিটে লুটিয়ে পড়ল অসংখ্য যুবকের দেহ। সি. আর. পি-রা পরমহংস রামদাসজির আখড়ায় ঢুকে নিরীহ সন্ন্যাসীদের টেনে বার করে ঝাঁঝরা করে দিল বুক।

সেদিনের ঘটনা না-হয় চোখের সামনে ঘটল, তাই দেখা গেল সন্ন্যাসীদের আত্মত্যাগ! কিন্তু তার আগে? অগণিত মহাত্মা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, দেশপ্রেমিক-শহিদ তাঁদের প্রজানুরঞ্জক ধার্মিক নৃপতির স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

তাঁদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি এবং তা হবার আশাও নেই, যতদিন না তাঁরা শ্রীরামজন্মভূমিকে মুক্ত করতে পারেন। ১৯৪৯ সনে আইনের যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে তাঁরা আদালতের আদেশের অপেক্ষায় থেকেছেন।

ভারতবর্ষের হিমালয়নিবাসী নিঃস্বার্থ সাধু-সন্ন্যাসীদের দল, ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের একমাত্র ধারক ও বাহক। ঈশ্বরের সাধনায় তাঁরা মগ্ন, কিন্তু সাধনার সে সুফল তাঁদের জন্য নয়, তা এদেশেরই পবিত্রতা রক্ষার জন্য। ব্যাসদেব, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, পরাশর, দধীচি—এঁরা নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য। তাঁরা পেয়েছেন রাজবন্দনা—দশরথ, যুধিষ্ঠির থেকে পরীক্ষিৎ, তাঁদের পদযুগল ধৌত করে ধন্য হয়েছেন। আর এ যুগের সাধুরা পেয়েছেন বিপরীত অভ্যর্থনা। যখনই রাষ্ট্রবিপ্লব, অরাজকতায় ছেয়ে গেছে দেশ, তখনই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই দাঁড়িয়েছেন দুর্ভাগা মানুষের পাশে। সত্যের পূজায় নিবেদিত সন্ন্যাসীর প্রাণ পবিত্র আর্যভূমির কল্যাণেই উৎসর্গিত।

দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর যখন তাঁরা দেখলেন আদালতে প্রতিকারের আশা সুদূরপরাহত, তখন তাঁরা আবার সম্মিলিত হলেন কখনও হরিদ্বারে, কখনও ত্রিবেণীসঙ্গমে, কাশীধামে, কখনও সরযূনদীর তীরে।

পূর্বে আন্দোলনে দেশের নৃপতিবর্গ ও আপামর জনসাধারণের সর্বশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল এই সাধু-সম্প্রদায়েরই আহ্বানে। বর্তমানে বিশ্ব-হিন্দু-পরিষদ এই আন্দোলনে সন্ন্যাসীগণের অনুগামী। কিন্তু এই ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাসে বিশ্ব-হিন্দু-পরিষদের আয়ুষ্কাল কতটুকু? এই জন্মভূমি-উদ্ধারের ইতিহাস কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ইতিহাস নয়।

রাজশক্তির আনুকূল্য ব্যতিরেকে রাষ্ট্রব্যাপী কোনো আন্দোলনের পক্ষে

সফলতা লাভ দুষ্কর। সম্রাট অশোকের সাহায্য ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা, গুপ্তরাজাদের উদারতা ও আর্থিক সহায়তা-ভিন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ, খলিফার আশীর্বাদ ব্যতীত দেশ-দেশান্তরে ইসলামের প্রচার, এবং বাদশাহ্-সম্রাটের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া পীর-ফকিরদের বিজয়যাত্রা সম্ভব ছিল না। মার্ক্সীয় দর্শনের বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচারের পিছনে ছিল রাশিয়ার লেলিন-স্ট্যালিনের প্রচেষ্টা।

অযোধ্যার রণাঙ্গণে হিন্দুগণ বারংবার যে অসাধারণ বীরত্ব শৌর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে যদি কিছুমাত্র রাজানুগ্রহ যুক্ত হত তা হলে ইতিহাস এত দীর্ঘ হত না। অযোধ্যার দুর্ভাগ্য। দেশ স্বাধীন হল দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে। এতকালের একটা সংগ্রামের দিকে এদেশের জনপ্রতিনিধিগণ একবার ফিরে দেখবার সময় পেলেন না! একবার জানতে চাইলেন না এর সমস্যাটিকে।

মন্দির-সংক্রান্ত ঘটনার এই প্রচারে জনসাধারণ জানবার সুযোগ পাচ্ছেন অযোধ্যার অতীত ইতিহাস—অন্যদিকে অনন্য শৌর্য-বীর্য আত্মত্যাগের গৌরবময় কাহিনী! এ ব্যাপারে দেশের রাজনৈতিক উপেক্ষা, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুন্নি-নেতার তুষ্টি-বিধানে প্রশাসনিক স্তাবকতা আজ কোন পর্যায়ে তাও অবিদিত থাকছে না।

এরজন্য দায়ী কে? আইনকে তার নিজের পথে চলতে বাধা দিচ্ছে কে? আইনকে উপেক্ষা করে দরজায় তালা দিল কারা? দেশের সঠিক ইতিহাস মানুষকে জানানোর দায়িত্ব কাদের? একথা ঠিক যে, বি. জে. পি এই সুযোগটাকে তার ভোটের কাজে ব্যবহার করতে ছাড়ছে না। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে একটা উত্তেজক ইস্যু পেলে কে-ই বা ছাড়ে। যারা এই সুযোগলাভে বঞ্চিত, তাঁরাই অগত্যা সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে একতার প্লাবন বইয়ে দিচ্ছেন। অথচ আদালতকেও তাঁরা নিজের পথে চলতে দিচ্ছেন না। একজন ভারতীয় যদি বলে যে সে ভারতীয়, সে হিন্দু—অমনি দেশ বিপন্ন হয়ে যায়?

শেষ পর্যন্ত তাই সাধুগণ মরবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। সময়টা ১৯৮৪ সাল। ১০০ জন মণ্ডলেশ্বর (একলক্ষ এক হাজার সন্ন্যাসী-শিষ্য থাকলে তবে একজন সন্ন্যাসী মণ্ডলেশ্বর-উপাধি লাভ করেন—অর্থাৎ এককোটি সন্ন্যাসীদের প্রতিনিধি) এবং সেই সঙ্গে একলক্ষ ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ তাঁদের অতীত ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সরযূতীরে তিল-তুলসী ও পবিত্র তীর্থবারি-হাতে শ্রীরাম-

জন্মভূমির দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, হয় তাঁরা তালা ভেঙে মন্দির অধিকার করবেন নয়তো প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

এই ঘটনার ঠিক একবছর আগে. ১৯৮৩ সালে বিশ্ব-হিন্দু-পরিষদের সহযোগিতায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। তার নাম, 'ধর্মস্থান-মুক্তিযজ্ঞ-সমিতি'। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই কমিটি একটি দাবিপত্র প্রেরণ করেন। তাতে বলা হয়, কাশী বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমি এবং অযোধ্যার রামমন্দির হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তখন স্বরাষ্ট্রদপ্তর ঐ দাবিসনদ উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। তারপরই ২৭ জুলাই গোরক্ষপীঠের মোহন্ত শ্রীঅবৈদনাথজিকে সভাপতি করে গঠন করা হয় 'শ্রীরাম-মুক্তিযজ্ঞ সমিতি'। তৎপরে ১৯৮৪ সালের ৭ অক্টোবর সরযূতীরে সাধু সম্প্রদায়ের ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা।

মন্দির পুনরুদ্ধারের পেছনে যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা রয়েছে, তাঁরা হলেন: কাঞ্চি কামকোটী পীঠের জগদগুরু শঙ্করাচার্য, শ্রীচন্দ্রশেখর সরস্বতী, শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুপুরী মহারাজ, শ্রীঅদ্বৈতনাথ-প্রমুখ।

অতঃপর ১৯৮৫ সালের ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর কর্ণাটকের উদীপীতে জগৎগুরু স্বামী রামানন্দাচার্য এবং কাশীর মহারাজ শিবরাম আচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট ধর্মসম্মেলন। হিন্দুধর্মের সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। সেই সমাবেশে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ১৯৮৬ সনের শিবরাত্রির দিন কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে শ্রীরামজন্মভূমিকে তালামুক্ত করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পরই, 'রামজন্মভূমি-মুক্তিযজ্ঞ সমিতি' উত্তরপ্রদেশ সরকারকে এক চরমপত্র দেন। তাতে বলা হয়, যদি সরকার আগামী ৮।৩।৮৬ তারিখের মধ্যে তালা খুলে না দেন, তাহলে সেই সমিতির পক্ষে সাধু-সন্ন্যাসীরাই তালা ভেঙে মন্দিরে দখল নেবেন। এই চরমপত্র পেয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা শুরু হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৮৬ সনে ২৫ জানুয়ারি তালা খুলে দেওয়ার জন্য মুন্সেফ কোর্টে আবেদন জানান তরুণ আইনজীবী শ্রীউমেশচন্দ্র পাণ্ডে। শ্রীপাণ্ডের এই আবেদনে. মুন্সেফ-আদালতের বিচারপতি বলেন, উক্ত মামলার নথিপত্র তাঁর কাছে নেই। কিন্তু সেই নথিপত্র চেয়ে পাঠানোও হল না। এই আবেদনের পরে তিন দিন অপেক্ষা করে ব্যর্থ হয়ে শেষে ফৈজাবাদের জেলা-জজের আদালতে শ্রীপাণ্ডে মামলাটি তুলে আনেন।

জেলা-জজ কৃষ্ণমোহন পাণ্ডে জেলা-শাসক শ্রী ইন্দ্রকুমার পাণ্ডে ও পুলিশ-সুপার করমবীর সিংহকে ডেকে পাঠান। তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, এই তালা কোনো আদালতের নির্দেশে দেওয়া হয়েছে কিনা। উত্তরে তাঁরা দুজনেই স্বীকার করেন: কোনো আদালতের নির্দেশ নেই—সে আদেশ তৎকালীন প্রশাসনের। জেলা-শাসক আরও বলেন, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট ঐ তালা বন্ধের নির্দেশ দেন নি; আর এও তিনি বলতে পারেন না যে, কোন সময় ঐ তালা দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণমোহন পাণ্ডে তাঁদের দুজনের কাছেই জানতে চান: ঐ তালা খুলে দেওয়া হলে তাঁরা এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবেন কি না। প্রত্যুত্তরে উভয়েই সম্মতি জানিয়ে বলেন, গেট থেকে তালা খুলে দিলেও এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে না।

এই কথা শোনার পরে শ্রী কে. এম. পাণ্ডে এই-মর্মে জেলা-শাসককে নির্দেশ দেন: কোনো আদালতের নির্দেশে যখন রামজন্মভূমিতে তালা দেওয়া হয় নি এবং তালাবিহীন অবস্থাতেও যখন জেলা-শাসক ও এস. পি. উভয়েই এলাকার শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম, তখন 'এই মুহূর্তেই' প্রশাসনের তরফ থেকে রামজন্মভূমিকে তালামুক্ত করা হোক। এই 'মুহূর্তে' বলতে বিচারপতি 'অবিলম্বে'-কথাটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। ফৈজাবাদ-আদালত এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন বিকাল চারটে-চল্লিশ মিনিটে—আর সে-দিনই বিকাল পাঁচটা-উনিশ-মিনিটে রামমন্দিরের তালা খোলা হয়।

এদিকে ততক্ষণে পুরো এলাকাটাই লোকে লোকারণ্য। বিশাল জনসমুদ্র রোষে-ক্ষোভে, আনন্দে-উচ্ছ্বাসে উত্তাল। দিল্লি থেকে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী এসে এ-বিষয়ে এস. পি. এবং জেলা-শাসকের সঙ্গে দফায়-দফায় বৈঠক করেন। সেনাবাহিনী নামানোর কথাও বলেন। কিন্তু এস. পি.-র প্রবল আপত্তিতে সেনা নামানো হয় নি। তিনি পরিষ্কার স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে জানিয়ে দেন, এই-মুহূর্তে সেনা নামানো নিতান্তই পাগলামি—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসীদের তাতে ঠেকানো যাবে না, সেনাবাহিনার মধ্যেও বিদ্রোহ জাগতে পারে। আরও বলেন, তাঁর এলাকায় মুসলমানদের শান্ত রাখতে এক ব্যাটেলিয়ন পুলিশই যথেষ্ট। বিচক্ষণ এই এস. পি.-র দূরদৃষ্টি ও দৃঢ়তার ফলেই অযোধ্যা সে-যাত্রা একটা রক্তপ্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

যাই হোক, এর পর ফৈজাবাদের এস. পি. এবং জেলা-শাসক যৌথভাবে সাধুসন্নিধানে উপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে বলেন, 'আমরা তালা খুলে দিচ্ছি, কিন্তু

একটা শর্ত : এই-মুহূর্তে এত লোক একসঙ্গে মন্দিরে ঢুকতে চাইলে একটা বিরাট অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। আপনাদের তরফ থেকে দশজন প্রতিনিধিকে পাঠান—যাঁরা উপস্থিত থেকে দেখবেন যে, আমরা ঐ দরজার তালা খুলে দিচ্ছি কি-না। এ নিয়ে সেই সময় সাধুদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ-কেউ বলেন, আজই মন্দির reconstruction শুরু করা হবে। কেউ বলেন, আইনের সহযোগিতায় যে-কাজ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে সেজন্য অহেতুক রক্তক্ষয় কেন?

অবশেষে অধিকাংশ সাধুর সম্মতি অনুসারে, ১০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৩৭ বছর পর ঐ তালা খুলে দেওয়া হল। ১৯৫০ সাল থেকে পুরোহিতরা পিছনের দরজা দিয়ে পুজো করে চলে যেতেন—সাধারণ মানুষ এতদিন রামচন্দ্রের জন্মভূমিতে যেতে পারতেন না। সেদিন থেকে রামমন্দির সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হল। তাঁরা সেখানে যেতে পারলেন পরের দিন থেকে।

কিন্তু আবার জটিলাবস্থার সৃষ্টি হল কৃষ্ণমোহন পাণ্ডের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহম্মদ হাসিম (একজন সুন্নি-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান) এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চে একটি রীট আবেদন করে (১৯৮৬।৭৪৬ নং) সে-আদেশ নাকচ করার প্রার্থনা করায়। ওয়াকফ্ সুন্নি সেণ্ট্রাল বোর্ডও অনুরূপ একটি রিট আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু হাইকোর্ট সেই আবেদনগুলি গ্রহণ করেন নি। পরে মহম্মদ হাসিম তাঁর রিট আবেদন সংশোধন করে মন্দির থেকে রামবিগ্রহ সরিয়ে নেবার আবেদন করেন। এদিকে ১৯৫০ সনের ২৫ নং দেওয়ানি মোকদ্দমার বাদী পরমহংস মোহন্ত রামচন্দ্র দাস এই মামলাটির বিরোধিতা করেছেন।

বাবরি মসজিদ অ্যাকশান কমিটির বর্তমান দাবি হল : দক্ষিণভারতের তিনজন বিচারপতিকে দিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করে পূর্বোক্ত মামলাগুলির বিচার করা হোক। এই দাবিতে তাঁরা আরও উল্লেখ করেন যে, ঐ বিচারপতিগণ যেন হিন্দু অথবা মুসলমান না হন। কিন্তু একমাত্র সুপ্রিমকোর্টই যদি মনে করেন, তদন্তের স্বার্থে ও ন্যায়বিচাবের স্বার্থে কোনো মামলাকে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করা উচিত, তবেই তা করা যায়।

এদিকে আবার উত্তরপ্রদেশ-সরকার পূর্বোক্ত বিচারাধীন মামলাগুলি বিচারের জন্য হাইকোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানিয়েছেন। তাতে কারণ দেখানো হয়েছে যে, হাইকোর্টে যে দুটি রিট আবেদন করা হয়েছে (১৯৮৬ সালের ৭৪৬ এবং ৩১০৬) তার বিষয়বস্তু এবং ফৈজাবাদ-কোর্টের মামলার বিষয়বস্তুগুলি একই। হাইকোর্ট যদি রিট আবেদনগুলির বিচার করেন, তবে হাইকোটের রায় বা কোনো মন্তব্যের

দ্বারা নিম্ন-আদালতের ঐ চারটি মামলার রায় বিঘ্নিত হতে পারে। সেজন্য দুটি রিট আবেদনের বিচার স্থগিত রেখে অথবা বিলম্বিত করে জেলা জজের আদালতের উপরোক্ত চারটি মামলা হাইকোর্টের দ্বারাই বিচার করা হোক।

সরকার-পক্ষের ঐ আবেদনে আরও প্রার্থনা করা হয়েছে : হাইকোর্টের দুটি রিট আবেদনের বিচার বিলম্বিত করে নিম্ন-আদালত থেকে হাইকোর্টে উক্ত চারটি মামলা হাইকোর্টে এনে তার বিচার করা হোক। এই আবেদনের প্রতিবাদীগণের অনেকেই আজ আর জীবিত নেই। সে কারণে নোটিশ-জারির আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও, তা জারি করা সম্ভব হয় নি। তাই এই ১৯৮৭ সালের (মিস কেস নং ২৯) মামলাটির শুনানি আর অগ্রসর হয় নি। মূল মামলাগুলির শুনানিও নয়।

এরপরে আবার একটি নতুন মামলা। এটি ১৯৮৯ সনের ২৩৬ নং মামলা। বাদীপক্ষে শ্রীরামজন্মভূমি ও আস্থান শ্রীরামজন্মভূমিতে-বিরাজিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও অন্যান্য বিগ্রহসমুদয় এবং বিবাদীপক্ষে পূর্বেকার সমস্ত মামলাগুলির সমস্ত পক্ষ এবং শিয়া-সম্প্রদায়।

এই মোকদ্দমায় অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট প্রিন্স আঞ্জুম কাদের তাঁর লিখিত বিবৃতির ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলেন, 'যাই হোক এতৎসত্ত্বেও এখন একথা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বলা হচ্ছে যে, যদি এই দাবি প্রমাণিত হয় যে, একটি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল ও মন্দিরের সেই ধ্বংস-স্থানে বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, তাহলে এই বিবাদী এবং অন্য-সমস্ত মুসলমান সানন্দে এই মসজিদ ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নেবে এবং সেখানে মন্দির-নির্মাণের জন্য সেই স্থান ফিরিয়ে দেবে।' উল্লিখিত প্রতিবেদনে আলমগীরের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে একথাও ঘোষণা করা হয় যে, 'বেআইনি অধিকৃত জমির উপর মসজিদ-নির্মাণ অনুমোদিত নয়। বে-আইনি অধিগ্রহণের নানা রকমফের আছে। যথা, কেউ যদি জবরদস্তি কারো বাড়ি বা জমি দখল করে সেখানে মসজিদ করে, তাহলে সেখানে নামাজ-পড়া শরিয়ত-বিরোধী কাজ হবে।'

আঞ্জুম কাদের সাহেবের সংশয়ের উত্তর এর আগে আমরা সমস্ত দিক থেকেই দিয়েছি, তবু আর-একবার বাবরিনামার সেই ফরমানটির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি : 'শাহেনশা-এ হিন্দ মালিকুল জাহান বাদশাহ বাবর হজরত জালাল শাহের ইচ্ছা-মোতাবেক অযোধ্যায় "জন্মস্থান" শাহি-কব্জায় নিয়েছেন। এখন থেকে ওখানে আর-কোনো হিন্দু প্রার্থনা করতে পারবে না এবং সকাল-সন্ধ্যা যে-কোনো সময়ে বহিরাগত কোনো তীর্থযাত্রীকে অযোধ্যায় ঘোরাফেরা করতে

দেখলেই তাকে পাকড়াও করে হাজতে আটক করা হবে।' [অযোধ্যা, যা যুদ্ধে আজও : বিনয় ভদ্র, বিশ্বহিন্দুবার্তা ১৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] খোদ বাবরিনামার এই স্বীকারোক্তি। মন্দির না থাকলে হিন্দুরা কোথায় যেত প্রার্থনা করতে ?

এদিকে সাধুসম্প্রদায় যখন দেখলেন, নানান কারণ দেখিয়ে শুধু কালক্ষয় হচ্ছে, তখন তাঁরা স্থির করলেন, কোর্টের রায় বের হওয়ার পরেই তাঁরা রামচন্দ্রের মূল জন্মভূমিতে অবস্থিত মন্দিরটির সংস্কার করবেন। তার আগে তাঁরা সেই স্থান থেকে বেশ অনেকখানি দূরে একটা আলাদা রামমন্দির স্থাপনের সংকল্প করলেন। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাঁরা আরও-একবার অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। রাজশক্তিকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা না করে আরও-একবার সম্মান জানালেন তাঁরা।

যাই হোক, এই নতুন মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনার সময় তাঁদের মাথায় কোটি-কোটি টাকার চিন্তা ছিল না। একজন শিয়া মুসলমানের দান করা জায়গায় একটি ছোটোখাটো মন্দিরের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা তাঁরা করলেন। আইনানুসারে প্ল্যান-মঞ্জুর, টাকার হিসাব, জায়গার দলিল সব-কিছুই করলেন। ঠিক এই সময়েই, অযোধ্যায় নতুন রামমন্দিরের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হলেন তিনজন বড়ো ব্যবসায়ী। কৌতূহলী হয়েই দেখতে গেলেন নতুন মন্দির কোথায় হচ্ছে।

সাধুদের এই কর্ম দেখে তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রত্যেকে পাঁচ-কোটি টাকা করে দান করতে চাইলেন। এককালীন ১৫ কোটি টাকার অর্থই বোঝেন না সাধুরা! তখন সেই ব্যবসায়ীদের সহযোগিতাতেই গঠিত হল রামমন্দির-ট্রাস্ট বোর্ড। ঐ বোর্ডের আইন-উপদেষ্টা ও অন্যতম সদস্য হলেন ভারতের প্রাক্তন এটর্নি-জেনারেল শ্রী লালনারায়ণ সিংহ। ভারতবর্ষ ও বাইরে থেকেও চাঁদা এল প্রায় ৯ কোটি টাকা। মোট ২৪ কোটি টাকার নতুন প্রজেক্ট তৈরি হল।

আবার নতুন করে প্ল্যান তৈরি হল। আরও-একটা প্লট নেওয়া হল—সেটিও এক শিয়া মুসলিম দান করলেন। আয়ব্যায়ের হিসাব, আয়কর বিভাগের ছাড়পত্র নিয়ে তৈরি হল নতুন প্ল্যান, এবং তা মঞ্জুরও হল। ঠিক হল সম্পূর্ণ মন্দিরটি নির্মিত হবে কোষ্টিপাথরে। ডাকা হল ভারতবর্ষের অন্যতম প্রখ্যাত নাগরশৈলি-বাস্তুকার শ্রীচন্দ্রকান্ত সোমপুরাকে—যাঁর পূর্বপুরুষেরাই বানিয়েছিলেন সোমনাথের মন্দির।

ইতালিয়ান মার্বেল আর কোষ্টিপাথরের প্রস্তাবিত মন্দিরটির দৈর্ঘ্য হল ২৯০ ফুট, প্রস্থ ১২৬ ফুট এবং উচ্চতা ১৩২ ফুট। এতে স্তম্ভ থাকবে ২১২টি,

গৃহগর্ভের আয়তন হবে ২০´×২০´ ফুট। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই-সমস্ত ডাটাতথ্য সরকারকে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্ল্যান যখন মঞ্জুর হয় তখন সরকার কি জানতেন না যে, মন্দিরটি কোথায় তৈরি হচ্ছে? তবু তারপরেও তার শিলান্যাসের দিন গুলিবর্ষণ হল নির্বিচারে—সে কি শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে?

যাই হোক, ঐ প্ল্যান মঞ্জুর হওয়ার পরেই কাশীতে পণ্ডিতদের দিয়ে শুভক্ষণ স্থির করে আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাসের দিন ঠিক হল। বলা বাহুল্য, তার সঙ্গে বর্তমান বিচারাধীন সৌধটির কোনোই সম্পর্ক নেই। রামমন্দিরের ইতিবৃত্ত এখানেই শেষ হল। এর পরের অধ্যায় কি হবে তা জানেন দেশের কর্ণধারগণ। ইতিহাস-লেখকদের ততক্ষণ বসে দেখতে হবে, আর তথ্য-সংগ্রহ করতে হবে। এর বেশি আর কি-ই বা করার আছে!

উপসংহারে শুধু একটা কথাই বলা যেতে পারে: এ-পর্যন্ত অযোধ্যার রামমন্দিরের যে সংগ্রাম-মুখর ইতিহাস, তার পুরোভাগে রয়েছেন ভারতবর্ষের সাধুসন্ত-সম্প্রদায়। তাঁদের এই বিরামহীন সংগ্রাম, আর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইংরেজ-আমল থেকে তার মধ্যে শঠতার বীজ বপন করা হয়। বহুমুখী দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের সূত্রপাত তখন থেকেই। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে তারই শোচনীয় পরিণতি আমরা দেখতে পেলাম। এই সংগ্রামে সাধু-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কোনো রাজনীতি ছিল না—আজও নেই। তবে তাঁরা একটা রাজশক্তির সহযোগিতা অবশ্যই চান। চরমতম সঙ্কটে রাজশক্তি-পরিচালিত প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচার চাওয়া কোনো অন্যায় নয়—অপরাধ নয়, রাজনীতিও নয়। বরং বলা উচিত, প্রশাসনের দিক থেকে সাহায্য না করাটাই বিস্ময়ের, দুঃখের এবং পরিতাপের।

১০

যে যুক্তি-বলে বাবরি মসজিদ কো-অর্ডিনেশন কমিটি আলোচ্য সৌধটিকে মসজিদ বলে দাবি করছেন, সে বিষয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার। তাঁদের মতে, লিডন আর্সকিন অথবা শ্রীমতী বেভরীজ-এর রচনায় এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, বাবর অযোধ্যায় এসেছিলেন। নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই যে, তিনি মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরির অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

শ্রীমতী বেভরীজ তাঁর অনূদিত বাবরনামার ফুট-নোটে যে ক্ষীণ মন্তব্য করেছেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অনুমান মাত্র। উক্ত কমিটি তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে আরও বলেন, শ্রীমতী বেভরীজ তাঁর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রচনা-দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐ মতকেই সমর্থন জানিয়েছেন।

ইংরেজশাসনের সময়, ব্রিটিশ অফিসারগণ গেজেটিয়ার ও অন্যান্য নথিতে ঘটনা নথিবদ্ধ করার সময় স্থানীয় মানুষজনের বক্তব্যের উপরই অধিক গুরুত্ব দেন—যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ১৮৭০ সালে পি. সি. কার্নেগীর লেখা 'এ হিসটোরিক্যাল স্কেচ' বইটি পরবর্তী গেজেটিয়ারগুলির আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র।

বাবরি মসজিদ কো-অর্ডিনেশন কমিটি আরও মনে করেন, ইংরেজ শাসকগণের ইতিহাস রচনার সময় 'ভাগ করে শাসন করো'—নীতিই কাজ করেছিল। প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটন অপেক্ষা বিভেদ-সৃষ্টিতেই তাঁরা ছিলেন অধিক আগ্রহী। যে-কারণে তাঁরা স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে 'Manufacture fact' তৈরি করেছেন, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির জন্যই।

কার্নেগীর হিস্টোরিক্যাল স্কেচ বইতে এটা অন্তত প্রমাণিত যে ১৮৫৫-থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত মুসলমানগণ ঐ স্থানে নামাজ পড়তেন। হিন্দুগণ পূজার্চনা করতেন বাইরে রাম-চবুতরার ছোট্ট মন্দিরটিতে।

বিতর্কিত সৌধটিতে ব্যবহৃত শিল্পকর্ম-যুক্ত কোষ্টি পাথরের স্তম্ভগুলি সম্পর্কে ঐ কমিটির মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : অযোধ্যায় বহুপূর্বে নির্মিত

মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ থেকে উক্ত কোষ্টি পাথরের স্তম্ভগুলি সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন এখনও এখানকার ধ্বংসস্তূপগুলি থেকে পুরাতন ইটপাথর স্থানীয় মানুষ নির্মাণ কার্যে ব্যবহার করে থাকেন।

ইংরেজ গবেষক হান্স বেকার তাঁর অযোধ্যা বইটিতে পূর্ববর্তী গেজেটিয়ার গুলিকেই অনুসরণ করেছেন। এই গ্রন্থে লেখক প্রকৃত কোন তথ্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হন নি। মাইকেল এইচ ফিসার-এর রচনার অগভীরতার ছাপ সুস্পষ্ট। কারণ তিনি বাবরি মসজিদ ও হনুমানগড়ি মসজিদের মধ্যে পার্থক্যই বুঝতে পারেন নি।

উল্লিখিত তথ্যে এটা প্রমাণ হয় না যে, উক্ত স্থানে কখনও কোন মন্দির ছিল। ঐ স্থানের মসজিদটির নাম রেভেনিউ রেকর্ডে উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন অঞ্চলের মসজিদ সেই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্বারাতেই চিহ্নিত হয়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে উক্ত স্থানের মসিদকে স্থানীয় মানুষ 'অযোধ্যা জামা-মসজিদ,' 'মসজিদ জন্মস্থান', 'মসজিদ সীতা-রসোই', 'মসজিদ জন্মভূমি'-প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে 'আয়ুধে' রামপূজার চল্ হওয়ার পর থেকে অযোধ্যা শ্রীরাম-নগরী রূপে খ্যাত হয়। এবং 'after the upsurge of the Ram cult in Oudh in the 16th Century Ayodhya was identified as the city of Ramchandraji and Ramkot where the Babri Masjid stands, as the Fort of Dasaratha.' [Babri-Masjid Ramjanmabhumi Controvesy : Asghar Ali Engineer P—220] রামকোট রূপে চিহ্নিত হয় বাবরি মসজিদ, যেটিকে রাজা দশরথের পুরী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই তথ্যে কিছুতেই প্রমাণ হয় না যে রামচন্দ্রজী'র জন্মভূমির উপর কোন মন্দির ছিল, যা ভেঙে এখানে বাবর ঐ মসজিদ নির্মাণ করান।

প্রত্নতত্ত্বের সূত্র ধরে তাঁদের অভিমত, অযোধ্যায় প্রথম জনবসতির নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে। এবং নানা সময়ে এই স্থানে মানুষের ক্রমান্বয়ে বসবাস চলতে থাকে খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত। তৃতীয় থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থানে স্থায়ী নির্মাণ কার্যের নিদর্শন মেলে না।' গুপ্ত যুগে অযোধ্যায় বড় কোন নির্মাণ কার্য হয়েছিল, বর্তমান সৌধটিতে তেমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।

তাঁরা আরও বলেন, রাজা বিক্রমাদিত্য রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ

করান। এখন কথা হল যদি এই রাজা বিক্রমাদিত্য গুপ্তযুগের শাসক হন, তাহলে প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টের ভিত্তিতে মন্দিরের দাবি সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ হয়ে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটিই জিজ্ঞাস্য যে, আদৌ কি বিতর্কিত স্থানটিতে স্মরণযোগ্য কোন মন্দির কখনও ছিল? যদি দেখা যায় ছিল তাহলে কে এবং কবে সেটি নির্মাণ করান?

সর্বোপরি শাহাবুদ্দিনের উদ্ধত ঘোষণা: 'There is no temple dedicated to Lord Rama······in the whole country dating back to earlier then the 16th century.'

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর কিঞ্চিৎ বিস্তৃতাকারে দেওয়া হবে। বলা হয়েছে যে অযোধ্যার ধ্বংসস্তূপ থেকে সংগ্রহ করা কোষ্টিপাথরের স্তম্ভগুলি মন্দির নির্মাণ কার্যে ব্যবহার করা হয়। একথা আপত্তিজনক।

শুধুমাত্র অযোধ্যাতেই নয় সারা ভারতবর্ষেই মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ গড়া হয়েছে। তার প্রমাণ কাশী, বৃন্দাবন তথা পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে আছে। প্রমাণস্বরূপ বড় খাঁ গাজীর সমাধি। ত্রিবেণীতে জাফরখাঁর মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই অজস্র হিন্দু-নিদর্শন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাফরখাঁ-সমাধির চারটি দ্বারেই হিন্দু-ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান।

বড়খাঁ গাজীর সমাধির অভ্যন্তরে কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তরলিপিও পাওয়া গেছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ডি. মনি তার পাঠোদ্ধার করেন। পরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলি সংশোধন করেন।

জাফর খাঁ গাজীর সমাধিকক্ষের দরজায় দুপাশে যে-সকল নিদর্শন রয়েছে তাতে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, সরাসরি ঐ স্থানের মন্দিরটিকে সমাধিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ-বিষয়ে শ্রদ্ধের সমাজ বিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের সিদ্ধান্ত এই: 'ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে জাফর খাঁ গাজী ও তাঁর পরবর্তী যোদ্ধারা ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অভিযান করে দখল করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়াতে ত্রিবেণী মুসলমান-অধিকৃত হয়। স্থানীয় দেবালয় দেবদেবী যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যায়।' [বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃ. ৪৮৩]

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে পাকিস্তানে গুরুদুয়ার ভেঙে মসজিদে রূপান্তরের ঘটনা অনেকেরই জানা। কোর্টের রায়কে অস্বীকার করে নিতান্ত বলপূর্বকতা করা হয়েছিল।

অবসর প্রাপ্ত আই. এ. এস, শের সিং তার 'What History says about Ayodhya'-নিবন্ধে লিডনে ও আর্সকিনের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বাবর ঐ স্তম্ভগুলি বাইরে থেকে সংগ্রহ করেন। 'Babur has recorded the carring of 26 pillars at Dhalpur on December 24, 1528 A. D. A sper of this Masque, only 26 pillars could be fitted' in the corners [Memoirs of Zahiruddin Muhammad Babur, trs. by J. Leyden and W. Erskine Vol. II, p. 362] তিনি অভিযোগ করেছেন, 'The whole mischief was started by P. Carnegy in 1870'—কারণ ফৈজাবাদ গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, 'Material of the old temple was largely employed in building the Mosque····· the outer beam of the main structure being of Sandal wood'.

মাননীয় Singh-এর তথ্যকে স্বীকার করে নিলে এটা অন্ততঃ অসত্য প্রমাণিত হয় যে, অযোধ্যার ভগ্নস্তূপ থেকে সংগ্রহ করা স্তম্ভ দিয়ে বাবরি মসজিত নামের বিতর্কিত সৌধটি তৈরি হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বাবরনামা পুস্তকটিই যে সংশয়াতীত নয় সেটি আগে বোঝা দরকার। Singh আরও একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন, 'These pillars are the root-cause of the whole confusion'—কারণ উক্ত স্তম্ভগুলি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে সৌধটি হিন্দুমন্দির, মসজিদ নয়। এই কারণে তিনি গত চারবছর ধরে বি. এন. পাণ্ডের সহায়তায় ঐ স্তম্ভগুলি নিয়ে গবেষণা করে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, স্তম্ভগুলির বয়স ৫০০ বছরের বেশি নয় : 'I found that what has been mistaken as 'kasauti' is the sealing-wax, layer mixed with kuruvindum Rayee stone in 1:2 ratio. Beneath this layer is the middle layer of steel powder mixed with mortar.

'The inner-most layer applied on the surface of ordinary stone is the layer of gum, molasses and pulses, which can be seen with the naked eye on the so-called Janmabhoomi pillar standing on Mahatma Gandhi Rood, near Faizabad contonement.' [Babur Masjid-Ramjanambhoomi Controversy p. 81]

অর্থাৎ নীল করা গালার সঙ্গে লৌহচূর্ণ, সেই সঙ্গে চুনবালির থার এবং গুড় আর ডাল মিশিয়ে ঐ রকম স্তম্ভগুলি তৈরি হয়েছে। সর্বপরি তিনি বলেছেন ঐ স্তম্ভগুলির বয়স ৫০০ বছরের বেশি নয়। তাঁর মতে খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐ প্রযুক্তির চল ছিল। কিন্তু অযোধ্যার নির্দিষ্ট ঐ মন্দিরটি ছাড়া অন্যকোন স্থানে তার ব্যবহার হয় নি কেন? শ্রীরামমন্দিরে ব্যবহৃত স্তম্ভের সঙ্গে ফকির জালাল শাহের সমাধি প্রান্তরে পড়ে থাকা স্তম্ভের সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ফৈজাবাদ ক্যানটনমেণ্টের কাছে দণ্ডায়মান স্তম্ভ কখনই এক নয়। উক্ত কমিটি প্রত্নতত্ত্বের রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেন, যে খ্রীষ্টিয় ৩য় শতক থেকে ১১শ শতক পর্যন্ত অযোধ্যায় স্থায়ী বসবাসের ও নির্মাণকার্যের কোনো নিদর্শন মেলে না। বিশ্বকোষ থেকেদৃষ্টান্ত সহযোগে এই অভিযোগ খণ্ডন করা যায়।

'৫০০ খ্রী. অব্দে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন। তখন নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রাচীরের ভিতরে ভাঙ্গা মন্দির ও অট্টালিকা রাশি হইয়া পড়িয়া আছে। কয়েকজন দরিদ্র সন্ন্যাসী ভিন্ন নগরে আর কেহ নাই।' [বিশ্বকোষ ১, পৃ. ৫২৫]

এরপর খ্রীষ্টিয় ৭ম শতাব্দীতে চীনা-পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ অযোধ্যায় আসেন। তিনি লিপিবদ্ধ করেন, 'তখনও প্রায় বিশটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। সেই মন্দিরে প্রায় তিন হাজার মহান্ত বাস করেন। সে সময়ে ব্রাহ্মণদেরও প্রায় বিশটি মন্দির বিদ্যমান ছিল।' [তদেব]

খ্রী.পূর্ব ৫ম শতাব্দীতে জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর মহাবীর অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময় জৈনদের অন্যান্য তীর্থঙ্করগণও এখানে জন্মগ্রহণ করেন। এবং তাঁরা সকলেই ইক্ষাকু বংশীয়। 'according to Jain tradition the 1st, 2nd, 4th, 5th, and 14th Tirthankaras were born in Ayodhya. Each of them belonged to the Ikshvaku family, just like Ram' [Ramjanmabhoomi Vs. Babari Masjid, p-21] জৈনদের তীর্থঙ্কর আদিনাথ ৯৬০ খ্রী. অব্দে অযোধ্যা নগরীতেই আবু পর্বতে দেহত্যাগ করেন। ২য় তীর্থঙ্কর অজিতনাথও অযোধ্যা নগরীতে পরেশ নাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

খ্রীষ্টিয় ৮ম শতাব্দীতে হিমালয় পাদদেশ থেকে আগত থারু নামে এক উপজাতি অযোধ্যায় এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করে। এরা এখানে বসবাসের সময় কোথাও রাজ্যবিস্তার করে নি। মনে হয় এরা

প্রধানত কৃষি নির্ভর। এর প্রায় শতাধিক বর্ষ পরে অযোধ্যার উত্তরপশ্চিম অঞ্চল থেকে আগত সোমবংশীয় নৃপতিগণ থারুদেরকে বিতাড়িত করে অযোধ্যা দখল করেন। এঁরা ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী। একাদশ শতাব্দীর শেষে কনৌজরাজ চন্দ্রদেব সোমবংশীয় রাজাদের পরাস্ত করে অযোধ্যা ও উত্তরকোশল তাঁর অধিকারে নেন।

উল্লিখিত তথ্যে এটা সুস্পষ্ট যে অযোধ্যা খ্রী· তৃতীয় অব্দ থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জনবিরল ছিল না। বড়ো মাপের কোন নির্মাণকার্য না হলেও গৃহাদি-নির্মাণ-ইত্যাদির কাজ তো অবশ্যই হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

পরিশেষে শাহাবুদ্দিনের সরব ঘোষণার উত্তর দেবেন এই দেশেরই সুশিক্ষিত সত্যনিষ্ঠ মুসলমানগণ। সৈয়দ আজিজ আলি, (ভারতীয় মুসলমান ফ্রন্টের পৃষ্ঠপোষক) ১৩ সেপ্টেম্বর ৮৯ টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছেন, 'I Appeal to my countrymen not to Judge the entire Muslim community by Shahabuddins activities'। জনৈক পার্শী দর্শনার্থী শ্রী জাল জিমি, দেখতে চান এখানে বাবরি মসজিদ কোথায় আছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে মন্দির ও তৎসংলগ্ন সমস্ত কিছুই নিরষণ করলেন। অতঃপর তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে বললেন, 'এখানে কোন মসজিদ নেই।'

এদের শেষ বক্তব্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি অভিমতকে কেন্দ্র করে। দেখা যাক তাঁর অভিমত কী। ইংরেজী ১৯৭৬, বাংলা ১৩৮২ সাল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামায়ণ সম্পর্কে একটি অভিনব মন্তব্য করে পণ্ডিতসমাজে নতুন ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর সেই মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করে কতিপয় ঐতিহাসিক রামায়ণকে বুদ্ধ-পরবর্তী যুগে, জাতক-কাহিনী অবলম্বনে রচিত বলে চালাতে চান। রামায়ণ সহ শ্রীরামচন্দ্রের ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু যেহেতু আচার্য সুনীতিকুমার কথাটা বলেছেন তাই বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

১৯৭৬ সালে জানুয়ারি মাসে সাহিত্য একাডেমির উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে প্রয়াত আচার্য, রামায়ণে গ্রীক-প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রামায়ণে রাবণ-কর্তৃক সীতা-হরণ ইলিয়াডের প্যারিসের হেলেনী-হরণের প্রভাবে পরবর্তীকালে সংযোজিত। [ইলিয়াড : ভাষান্তর মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, পৃ. ১১] তিনি আরও মন্তব্য করেন, প্রাচীন ভারতীয়

জনমানসে এবং রামায়ণে বর্ণিত রামচরিত্রের অপরিসীম বীরত্বব্যঞ্জক গাথার মূলেও গ্রীকপ্রভাব বর্তমান। [তদেব] অতঃপর ১৬ জানুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় তিনি বলেন, রাজাদশরথ ছিলেন বারাণসীর রাজা রামচন্দ্রের পিতা। স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য তিনি রামকে বনে পাঠান। সীতা রামচন্দ্রের বোন। বাল্মীকির মূল রামায়ণে ভাইবোনের সম্পর্কই বজায় ছিল। এই যুক্তির সমর্থনে তিনি বলেন, হিমালয়ের পাদদেশে উপজাতিদের মধ্যে অদ্যাবধি এই প্রথা বিদ্যমান। এই প্রথার কারণ হল, পৈতৃক সম্পত্তি একত্রে রাখা। সীতাচরিত্র সাবিত্রী ও দময়ন্তী-চরিত্রের আদর্শে গঠিত এবং রামচন্দ্রের চরিত্রের উপাদান অর্জুনের চরিত্র থেকে সংগৃহীত।

খ্রীষ্টিয় ৫ম শতকে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার রূপে পূজিত হন। খ্রী·পূর্ব ৫ম শতকে রামকাহিনী গাথার আকারে থাকলেও তখন এ কাহিনী মানুষের মনে দাগ কাটে না। খ্রীষ্টিয় ২য় শতকে রামায়ণ বর্তমানরূপ পরিগ্রহ করে। চারণ কবিরাই মূলত রামায়ণের কাহিনী প্রচার করতেন। তবে বাল্মীকিই রামকাহিনী-প্রচারের উল্লেখযোগ্য চারণ কবি।

ভাষাচার্যের এই বক্তব্য ১৯৭৬ সালের ১৭ই জানুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সুনীতিবাবুর উক্ত মন্তব্যে সমগ্র পণ্ডিতসমাজে বিশেষ ক্ষোভসঞ্চার হয়। অনেকেই তীব্র বিরোধিতা করেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য : প্রাতঃস্মরণীয় বর্ষীয়ান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, প্রয়াত পণ্ডিতপ্রবর কালিদাস তর্কশাস্ত্রী—যিনি সংস্কৃত রামায়ণের অন্যতম বিশেষজ্ঞ, আর ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিতকেশরী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। এঁরা বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা ব্যতীতও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বৃহদাকার প্রবন্ধে সুনীতিবাবুকে আক্রমণ করেন। প্রয়াত আচার্য এঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে তো পারেনই নি, পরন্তু তাঁর আকস্মিক মন্তব্যের জন্য গভীর মনোবেদনা অনুভব করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দগ্ধ হন।

বলা বাহুল্য সুনীতিবাবুর উক্ত মতকে বিশিষ্ট বিদ্বৎজনেরাও সমর্থন করেন নি। আচার্য ডঃ সুকুমার সেন ও রমেশচন্দ্র মজুমদারসহ প্রায় সকল বিদগ্ধ সমালোচকগণই তাঁর বিপক্ষে রায় দেন। তাঁদের সে বিরোধিতা নিতান্তই প্রচলিত সংস্কারের-বশেই নয়, তা করা হয় রীতিমতো তথ্য-প্রমাণের দ্বারাই।

আচার্য সুনীতিকুমার রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন, তাই তাঁর মন্তব্যের উত্তর রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই দেবার চেষ্টা করি :

'প্রাচীন আর্য সভ্যতার এক ধারা ইউরোপে এবং অন্য ধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্য এবং ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে।' [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩ খণ্ড, পৃ. ৬৬২ (৪)]

'রামায়ণ-মহাভারতকে কেবল মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ···ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে-কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ-ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' [তদেব, পৃ. ৬৬২ (৪)]

'প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর-একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, ক্ষত্রিয়দলের এই ভক্তি-ধর্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল।' [তদেব, পৃ. ১৪৮]

'আর্য-অনার্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে একটি মহা-উদ্‌যোগের অঙ্গ, রামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্‌যোগের নেতারূপে আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এই তিনজনের মধ্যে কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত যোগ নহে, একটা এক-অভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায়। বুঝিতে পারি, রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা—এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।' [তদেব, পৃ. ১৪৫]

'একদা যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশোদ্ভব পরশুরামের ব্রত ছিল ক্ষত্রিয়বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ-বীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করা যায়, ঐক্যসাধন ব্রত গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাহার প্রথম পর্বেই কতক বীর্যবলে কতক ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্যেই এই উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।' [তদেব, পৃ. ১৪৭]

এ পর্যন্ত সুনীতিবাবুর মন্তব্যের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশের পরে আর নতুন করে কিছু না বললেও চলে। উল্লিখিত তথ্যে রামায়ণের বিষয়

বস্তু, তার ঐতিহাসিকতা, সামাজিক চিত্র, ধর্মীয় রীতি, আধ্যাত্মিক সজীবতা এবং রামচন্দ্রের চরিত্রে ভারতীয়তা বা সুনীতিবাবুর ভাষায় Indiani:m যোল আনাই বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিস্তারিত আলোচনায় প্রাচীন ভারতের একটি অখণ্ড সংস্কৃতি-প্রবাহের কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রয়াত আচার্য জাতক কাহিনী থেকে রামায়ণের সৃষ্টির কথা বলেছেন—অতএব সে-বিষয়েও এ ক্ষেত্রে পৃথকভাবে উত্তর দেওয়া দরকার।

প্রথমেই আসা যাক জাতক প্রসঙ্গে।

বুদ্ধদেব খ্রী.পূর্ব ৫০০ বছর পূর্বে আবির্ভূত হন। রামায়ণের কাল অন্তত খ্রী.পূর্ব ৪০০০ বছর। সময়ের ব্যবধানে বুদ্ধের চেয়ে রামায়ণের কাল ৩৫০০ বছর পূর্বে। শ্রীরামচন্দ্র দশাবতারের ষষ্ঠরূপ—পরশুরামের পর তাঁর মর্ত্যে আবির্ভাব পূর্ণাবতার রূপে। বুদ্ধ অবতারের কথা জয়দেবের স্তোত্রে উল্লিখিত হলেও প্রাচীন শাস্ত্রে তার উল্লেখ নেই। বরং সেখানে কল্কি অবতারের কথা বলা হয়েছে।

রামায়ণের মধ্যে একটা ধর্মীয় ঐতিহাসিক দিক আছে—যাকে বিদেশী গবেষকগণ আর্য-অনার্যের বিরোধ বলেছেন। আমাদের দেশের বিদেশ-প্রেমী ঐতিহাসিকেরা সেই কথাকেই শিরোধার্য করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের বিষয়বস্তু আর্যদের সঙ্গে অনার্যের সংঘাত নয়—শৈবপন্থীদের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধ। অর্থাৎ তন্ত্রের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব।

যখন নব্য-তন্ত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংঘাত তুঙ্গে, সমাজের সাধারণ মানুষ যখন উক্ত মতবৈষম্যের ফলে অনেকাংশেই বিভ্রান্ত—আগম না নিগম, মন্ত্র না ক্রিয়া, বৈদিকবিধিযুক্ত সংযম নাকি প্রকৃতি-জাত সহজপন্থায় শিব আবিষ্কৃত পথে জীবনের ঈপ্সিত লাভ, ঠিক তখনই বুদ্ধের আবির্ভাব—মন্ত্র নয়, তন্ত্রও নয়। মূর্তির আরাধনা কিংবা হোমাগ্নির পূত বিভূতির ভস্মতিলক নিস্প্রয়োজন। শুধু সংযম-নিষ্ঠ নয়, মনন—জ্যোতির ধ্যান, যোগের পথে জীবনের উত্তরণ। মোক্ষের স্বরূপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি মৌন অবলম্বন করলেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব মোক্ষ, আত্মা ও ঈশ্বরের সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু না বলেও যোগের পথে একটা নতুন পন্থার সৃষ্টি করলেন মাত্র। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তন্ত্রাচার বুদ্ধদর্শনকে গ্রাস করে ফেলে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর তিনশ বছর পরে, যোগেশ্বর মহাদেবের ধ্যানাসনের অনুকরণে তাঁর প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়।

এই পর্বেই শুরু হয় জাতক-কাহিনী রচনার। যে জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বুদ্ধদেব জন্মের কারণ 'ভব' বলে নির্বাক থেকেছেন, তাঁর পরবর্তী যুগে

সেটাকেই পল্লবিত করে দেখানো হল জাতক-কাহিনীতে। এই কাহিনী রচনার উপকরণ সংগ্রহ হয় প্রাচীন কাহিনীগুলি থেকে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, প্রচলিত গাথা কোনো কিছুই বাদ যায় না। এই কাহিনীতে স্থান পেয়েছে চোর, ফেরিয়ালা, বারবনিতা, মণ্ডপ-সহ উৎপলপর্ণার মতো বিদুষী।

প্রকৃতপক্ষে জাতক-কাহিনীর বহুমুখী প্রবাহের সঙ্গে একমাত্র কথাসরিৎ সাগরেরই তুলনা চলে, রামায়ণ-মহাভারতের নয়। এই কাহিনী রচয়িতাগণ সমাজের এমন কোনো দিক নেই যা তাঁরা বাদ দিয়েছেন। সমাজের সকল স্তরেই বুদ্ধদেব কখনও না কখনও আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি মানুষকে কত ভালবাসতেন, তিনি তাঁদের কত আপন এটা প্রমাণ করতেই জাতক কাহিনীতে এমনই বহু বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের অবতারণা। এককথায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচারের দিকে নজর রেখেই, সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যই জাতক-কাহিনীর সূত্রপাত। তাই সেখানে রাম-জাতক একটা নয় ১২টা গাথায় পল্লবিত। প্রকৃত পক্ষে যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ—আবার তিনিই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ, এটা প্রমাণ ও প্রচার করতেই দশরথ-জাতক। তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতেই জাতকে রামায়ণের পুনরাবৃত্তি—জাতক থেকে রামায়ণ নয়।

দ্বিতীয়ত, রামায়ণ কোনো ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত নয়। এটি একটি অনাগত কালের সংস্কৃতি প্রবাহ। রামায়ণের প্রাণশক্তি মহাকালের রথচক্রের সঙ্গে সংযুক্ত। জাতক কাহিনীতে সেই অখণ্ডতা দৃষ্ট হয় না। রামায়ণ একদিকে ইতিহাস, অন্যদিকে ধর্মগ্রন্থ। জাতকে শুধুমাত্র সমাজের বহুমানুষের বহুচরিত্রের মধ্যে বুদ্ধদেবকে মিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। রামায়ণের বৈচিত্র্য বহুমুখী কিন্তু উৎস এক এবং প্রবাহ অখণ্ড। জাতকের উৎস ৫৫০ জন্মের ৫৫০টি বিচিত্র কাহিনী, কিন্তু অখণ্ডপ্রবাহের পারম্পর্য এখানে লক্ষিত হয় না। রামায়ণের রূপক-অঙ্গে দর্শনের প্রাচুর্য এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও একাব্য তুলনারহিত। জাতকে সমাজের বাহিক চিত্রটুকুই প্রাণবন্ত—গভীরে রসসঞ্চারের শক্তি তার নেই। সুতরাং এ-মত কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যে, জাতক থেকে রামায়ণ-কাহিনী সংগৃহীত। তাছাড়া দশরথ-জাতকে শত্রুঘ্ন ও হনুমানেরও উল্লেখ নেই। যার থেকে বোঝা যায়, রামায়ণের কাহিনীই জাতকে প্রবিষ্ট হয়েছে। তার কারণ বুদ্ধদেবকে রামচন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম করে গড়ার মানসিকতা অন্যদিকে রামভক্তকে বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য!

আচার্য ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় বৌদ্ধজাতক থেকে রামায়ণের উদ্ভব-

বিষয়ক মতবাদকে স্বীকার করেন নি। 'তিনি রামায়ণের প্রাচীনত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এই মহাকাব্যের উৎসমূলে ঋগ্বেদের একটি কাহিনী নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে ঋগ্বেদের ভদ্র, ভদ্রা এবং অগ্নি রামায়ণের যথাক্রমে লক্ষ্মণ সীতা ও রামরূপে দেখা দিয়েছেন।' [ইলিয়ড : ভাষান্তর মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, পৃ. ১৬]

ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে জাতক-কাহিনীতে রামায়ণ-কাহিনীকে বিকৃত করা হয়েছে। তিনি রামায়ণে দশরথ-জাতকের প্রভাব খণ্ডন করে প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভারতবর্ষে রামকথার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন এবং তা জাতকের বহু পূর্ব থেকে। [তদেব]

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় রামায়ণে বৈদিক প্রভাব সমর্থন করে এই মহাকাব্যটিকে মিথ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যা দু-হাজার বছর ধরে ভারতীয় জনমানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। [তদেব]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, আলেক্জান্দারের ভারত-আক্রমণের আগে ভারতীয়-সাহিত্যে কোনোরূপ গ্রীক-প্রভাব পড়েনি। তাঁর মতে রামায়ণ সম্পূর্ণরূপে গ্রীকপ্রভাবমুক্ত। [তদেব]

শ্রীঅরবিন্দ বাল্মীকির কাব্যকে বলেছেন 'Oceanic Poetry , রামায়ণে সাগরপারের এক কাহিনী প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—সেদিক হইতে নয়, রামায়ণে পাই মহাসাগরের বিশালতা, মহাসাগরের বৈচিত্র্য।' [প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার ১, পৃ. ৩১৪]

সময়ের বিচারে বুদ্ধদেব খ্রী.পূর্ব ৫ম শতাব্দী হলেও জাতক-কাহিনী রচিত হয়েছে খ্রীষ্টিয় ২য় বা ৩য় শতাব্দীর মাঝামাঝি—এবং লিখিত হয়েছে আরও অনেক পরে। তার কারণ মনে হয়, জাতকের কাহিনীগুলি ধর্মীয় সংগঠন-বৃদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন ধর্মসভায় আলোচিত হত ধর্মপ্রচারকদের মুখে। গ্রামেগঞ্জে, নানান পেশার নানান মানুষের মাঝে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ যেতেন, তাদের জীবনধারা মনোনিবেশ-সহকারে অবলোকন করতেন। অতঃপর তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হত একটি জাতক-কাহিনী—যার নায়ক বুদ্ধদেব। এইভাবে যখন তা একটি-দুটি করে অসংখ্য-অগণিত কাহিনীতে পল্লবিত হয়ে ওঠে, তখনই সেগুলিকে কেউ বা কয়েকজন লিখিত রূপদান করেন, সংযোজন-বিয়োজন তখনও হয়েছে। গল্প-প্রধান-কাহিনীগুলি হয়ে ওঠেছে নীতিপ্রধান।

অধ্যাপক ফৌসবেল এইগুলিরই অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তার মধ্যে

কয়েকটি কাহিনী আবার একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। তা থেকে অনুমান করা যায়, জাতকের একই গল্প বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন-ভিন্ন রূপধারণ করেছিল শুধুমাত্র ঐক্য বজায় ছিল নীতিকথার ক্ষেত্রে।

অধিকিন্তু, জাতকে যে কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে তা বুদ্ধদেবেরই ৫৫০ জন্মের পূর্ববর্তী তাঁরই জন্মকথা। অর্থাৎ বুদ্ধের জন্মের কাল হতে জাতকের গল্পগুলি সংগ্রহের কাল বহু পূর্ববর্তী সময়কালে বিস্তৃত। যদি বুদ্ধদেবের পরবর্তী পূর্ব-পূর্ব জন্মের কাহিনী জাতকে বিবৃত হয়, তাহলে রামায়ণের কাল জাতকের বহু বহু পূর্ববর্তী তা বলাই বাহুল্য। আর তাছাড়া জাতকের কাহিনীতে যে-সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়, তা (বুদ্ধের ৫৫০ জন্ম) অন্তত ২৭ হাজার বছর পূর্বের মানবসভ্যতার বিপরীত।

'দশরথ জাতকে' রামের বনবাস-ভরতের রাম-পাদুকা-গ্রহণ প্রভৃতি বৃত্তান্ত বর্ণিত হলেও রামায়ণের সঙ্গে এই জাতককাহিনীর বৈশাদৃশ্যও অল্প নয়। এই জাতকে দশরথ হলেন বারাণসীর রাজা, আর তাঁর পুত্র রামচন্দ্র হলেন রামপণ্ডিত। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা দশরথের প্রথমা মহিষীর সন্তান। এই মহিষীর মৃত্যু হলে রাজা দশরথ দ্বিতীয়বার এক রমণীকে অগ্রমহিষী করেন। তাঁর গর্ভে ভরতকুমারের জন্ম হয়। নবীনা মহিষী স্বীয় পুত্রের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করলে, দশরথ বিমাতার কূট চক্রান্ত থেকে তাঁর তিন সন্তানকে রক্ষা করার জন্যই দ্বাদশ বৎসর বনবাস দেন। কিন্তু বনবাসের কাল পূর্ণ হওয়ার তিন বৎসর পূর্বেই দশরথের মৃত্যু হয়। তখন ভরত তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য বনে গমন করেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদে সীতা ও লক্ষ্মণ বারংবার সংজ্ঞাহীন হলেও রামপণ্ডিত ধৈর্য হারা হলেন না। তিনি সংসারের অনিত্যতার ব্যাখ্যা করে বাকি তিন বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করার কথা বলেন। তখন ভরতকুমার রামের পাদুকা-সহ সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর রামের পাদুকাকে প্রতিনিধি করে তিনি রাজ্য পালন করতে লাগলেন। তিন বৎসর অতিবাহিত হলে রাম পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করে রাজপদে অভিষিক্ত হলেন।

সীতা রামের সহোদরা ভগ্নী এ-তথ্য সর্বৈব নতুন। এই জাতকের শেষে যে গাথাটি আছে আর্য রামায়ণের উক্তির সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়:

দসবস্‌স সহস্‌সানি সট্‌ঠিবস্‌স সতানি চ।
কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রজ্জমকারয়ি॥ (দশরথজাতক)

দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।

রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥ (রামায়ণ, বালকাণ্ড)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শুধুমাত্র দশরথ জাতকের ক্ষেত্রেই তাঁকে বারাণসীর রাজা বলা হয় নি, অধিকাংশ জাতকের আরম্ভই হয়েছে, 'অতীতে বারাণসীয়ং ব্রহ্মদত্ত রজ্জং কারেসি'—কথাটি দিয়ে। সুতরাং রামায়ণের রাজা দশরথ যে বারাণসীর রাজা ছিলেন, এ-কথা মনে করার কোনোই যুক্তি নেই।

রামায়ণের আদর্শেই অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত রচনা করেছিলেন একথা মনে হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডের (৯।১১) বিলাসিনী পরিবেষ্টিত রাবণের অন্তপুরের বর্ণনার সঙ্গে রমণীগণ-পরিমণ্ডিত সিদ্ধার্থের বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ মহাকবিগণ রামায়ণ থেকেই বহু উৎকৃষ্ট কাব্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন তা সকলেরই জানা আছে। ঠিক একইভাবে বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থের উপর রামায়ণ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বলা যায়। 'বৌদ্ধগণ রামকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, যদিও তাহাতে পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। সিংহল, যবদ্বীপ-প্রভৃতি বৌদ্ধ-প্রভাবিত স্থানে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। জৈনগণের রামায়ণ "পউমচরিঅ" সুবিদিত। এই সকল সম্প্রদায় নিজ-নিজ মতবাদ প্রচারের বাহন রূপে রামায়ণকে নির্বাচন করিয়াছিলেন এই জন্য যে, ইহা জনসাধারণের নিকট অতিশয় আদরণীয় ছিল এবং ইহার মাধ্যমে প্রচারিত মতবাদ তাহাদের মর্মে প্রবেশ করিয়াছিল।' [সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ· ১০৪]

'বৌদ্ধ রামানন্দ ঘোষ "নতুন রামায়ণ" রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে বৌদ্ধতন্ত্রের ও যোগাচারের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইহা মহাযান-সম্প্রদায়ের শক্তিবাদী বৌদ্ধগ্রন্থ।' [তদেব পৃ· ১০৪]

ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণ ও জাতক-কাহিনীর আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। পণ্ডিত Jacabiর মতে, 'জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের নিমিত্ত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোক পালিভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় ঐ যুগে ইহাই সাধারণ লোকের ভাষা ছিল। বুদ্ধদেব খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতকে "সকায় নিরুত্তিয়া" বা জনসাধারণের স্বকীয় ভাষায় স্বীয় ধর্ম প্রচারের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন; এই ভাষাও পালিভাষা। ইহা হইতে মনে হয়, বুদ্ধদেবের সময়েই কথ্য ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের প্রচলন লুপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ সংস্কৃতে রচিত। ইহা জনপ্রিয়

এপিক এবং মনে হয় জনসাধারণের ভাষায় ইহা রচিত হইয়াছিল : তাহা ছাড়া রামায়ণের ভিত্তি যে গাথা তাহা সাধারণ লোকের মধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং অনুমান করা যায়, ইহা সেই যুগে রচিত হইয়াছিল যখন সংস্কৃত কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত। অতএব সম্ভবত বুদ্ধপূর্ব যুগেই এপিক রামায়ণ রচিত হইয়াছিল।' [তদেব পৃ. ১০৪]

অশ্বঘোষের রচনায় রামায়ণের প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় একই সময়ে কুমারলাতের 'কল্পমণ্ডিতিকায়' জনগণের মধ্যে রামায়ণের কাহিনী পরিচিতি থাকার উল্লেখ আছে।

চীনদেশীয় গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় খ্রীষ্টিয় ৪র্থ শতকে বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর সময়ে রামায়ণ বৌদ্ধগণের কাছে সুবিদিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে জৈন বিমলসুরি স্বীয় প্রাকৃতকাব্য 'পউমচরি অ'তে রামোপাখ্যান লিপিবদ্ধ করেছেন।

উল্লিখিত তথ্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকের পূর্বে রামায়ণ শুধু রচিতই হয় নি, যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছিল। নানাযুক্তির অবতারণা করে ভিণ্টার নিৎস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীতহয়েছেন যে, সম্ভবত খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে রামায়ণ বর্তমান-রূপ পরিগ্রহ করে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, তন্ত্রাচারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বৈদিক আচারের দূরত্ব একটা ছিলই। বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে তন্ত্রাচার সাময়িকভাবে রুদ্ধ হলেও পরে তা বৌদ্ধাচারকেও আত্মসাৎ করে। বুদ্ধদেব তাঁর ধাত্রী মাতার অনুরোধে সংঘে মহিলা-প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। ফলত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তান্ত্রিক ও বৌদ্ধরা একত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর আঘাত হানে। সাময়িক ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রুদ্ধ অনেক স্থলে তা লুপ্তও হতে থাকে। নিরুদ্ধ হয় সংস্কৃতচর্চা। সমাজ থেকে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব নিঃশ্চিহ্ন করার নিমিত্তেই বৌদ্ধ রাজশক্তির সহায়তায় জাতীয় স্তরে প্রাকৃত ও পালি ভাষার ব্যবহার শুরু হয়।

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের নির্দিষ্ট পথে চলছিল না, তা হয়ে উঠেছিল তন্ত্রের প্রচারের বাহন মাত্র। কিন্তু তৎপূর্বেই রামায়ণ মহাভারত জনসমাজে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেই প্রভাব খর্ব করতেই জাতক প্রভৃতি কাহিনীর মাধ্যমে রামায়ণসহ বৈদিক শাস্ত্রগুলিকে আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা। বৌদ্ধদের সঙ্গে শৈবাচারী বা তান্ত্রিকদের যে আত্মিক

সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল তা মহাদেবের আদলে বুদ্ধদেবের চিত্রেই প্রমাণিত। এর পরবর্তী যুগে শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্ম প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। অতঃপর ব্রাহ্মণ্য রাজন্যবর্গ ক্ষমতায় আসীন হলে স্বাভাবিক কারণেই বৌদ্ধ প্রবাহ ম্লান হতে ক্ষীণতর, পরিশেষে জীর্ণ প্রায় হয়ে যায়।

এদিকে শুরু হয় গুপ্তযুগ। বৌদ্ধ ও তন্ত্রের সম্মিলিত প্রতিরোধে আত্ম-গোপনকারী ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার স্বরূপে প্রকাশিত হয়। তখন আবার বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খর্ব করতে রামায়ণ মহাভারত বিশেষভাবে প্রচারিত হতে থাকে। শুরু হয় জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরেও নতুন করে সংস্কৃত চর্চা। জাতকের প্রভাব খর্ব করতেই সম্ভবত এই পর্বে স্কন্দপুরাণে রামায়ণের কথা সংযুক্ত করা হয়। কালিদাস প্রমুখ রামায়ণ থেকে কাহিনী নিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্য রচনা করেন।

আমাদের দেশের ও বিদেশের কিছু পণ্ডিত ইতিহাসের পালাবদলের এই সন্ধিক্ষণটিকে শুরু ধরে নিয়ে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য গুলিকে এই যুগের রচনা বলার পক্ষপাতী। মনে হয় তাঁরা দর্শনের পালা বদলের সামাজিক কারণ গুলির দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি তাই এই ভ্রমাত্মক বিপত্তির উৎপত্তি।

এবার আসা যাক সুনীতিবাবুর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তিনি অনুমান করেছেন। রামচরিত্র অর্জুনের অনুসরণে এবং সীতা হলেন দময়ন্তী ও সাবিত্রীর আদলে গঠিত। মাননীয় আচার্যের এ নিছকই অতি কল্পনা।

সকলেই জানেন রামায়ণ একটি কাব্য এবং আদিকাব্য। অন্যদিকে মহাভারত মহাকাব্য নামে অভিহিত হলেও তা, প্রকৃতপক্ষে একটি পুরাণ। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ব্যাসের আর এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্য সমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন।' [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৫৬]

মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত 'রামোপাখ্যান পর্ব'-এ বাল্মীকি রামায়ণের সম্পূর্ণ কাহিনী—রাম-লক্ষ্মণাদির জন্ম-বৃত্তান্ত থেকে সীতার উদ্ধার ও গ্রহণ, রাজ্যাভিষেক, অঙ্গদ ও বিভীষণের অভিষেক সমস্তই অনুপুঙ্খ বিবৃত হয়েছে। শুধুমাত্র উত্তরাকাণ্ডের কাহিনীই এখানে উল্লিখিত হয় নি—তাতে বাল্মীকি রামায়ণের এই অংশ পরবর্তী সামাজিক সংকোচনের কালে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত তা স্পষ্টই প্রতীত হয়। এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তেই প্রমাণিত যে,

মহাভারতের বহুপূর্বেই রামায়ণ রচিত ও সমাজে বহুলপ্রচারিত। এতদ্ব্যতীতও মহাভারতে রামায়ণের উল্লেখ আছে একাধিকবার। বিশেষত এক বাল্মীকির নামই মহাভারতে ৮ বার উল্লিখিত। মহাভারতে বিবৃত রামায়ণের কাহিনীগুলিকে পৃথক করলে তাই দিয়েই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হতে পারে। ভীম ও হনুমানের কাহিনী যে-কোন মহাভারত পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন উদাহরণ আরও আছে, কিন্তু তা নিষ্প্রয়োজন।

মহাভারতের অর্জুন তৃতীয় পাণ্ডব। তিনি রণনিপুন ও কৌশলী যোদ্ধা। ধনুর্বিদ্যায় পারঙ্গম কৃষ্ণসখা পার্থরূপে পরিচিত। কৃষ্ণের নির্দেশ ব্যতীত একপদ অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতাও তাঁর নেই। একমাত্র কর্ণই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী।

এমনকি কৃষ্ণের কৌশল ব্যতীত কর্ণকে বধ করার শক্তিও তাঁর নেই। রাজনীতি-ধর্মনীতি-কূটবিদ্যা-কোনটিই তাঁর আয়ত্বাধীন নয়। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ছায়া কিংবা তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান। যখন কৃষ্ণ নেই তখন অর্জুন নিষ্প্রভ। কৃষ্ণ সূর্য হলে অর্জুন তাঁর আলোয় আলোকিত পাণ্ডব পক্ষের শোভাবর্ধনকারী চন্দ্রস্বরূপ—তার বেশি কিছু তিনি নন।

কিন্তু রামচন্দ্র? তিনি যুগাবতার, একটি নতুন সভ্যতার জনক। সমগ্র উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত। তাঁর ভালবাসায় বানর ও ভল্লুকও বশীভূত। তিনি আদর্শরাজা, ত্যাগী, শাস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধে অজেয়। রাষ্ট্রনীতি ও উদারতায় তিনি তুলনাহীন। রামচন্দ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি কারো দ্বারা পরিচালিত নন। তাঁর বিনয়, দূরদৃষ্টি ও সাম্যনীতির সঙ্গে অর্জুনের কোন তুলনাই হয় না। সেখানে অর্জুনের সাদৃশ্যে তাঁর চরিত্রসৃষ্টি কিরূপে সম্ভব? সুনীতিবাবুর উক্ত মত গ্রহণযোগ্য কিনা পাঠকই বিচার করবেন।

সাবিত্রী ও দময়ন্তীর অনুসরণে সীতা-চরিত্রের উদ্ভব, একথা সুনীতিবাবুর উপযুক্ত কথাই বটে! কথায় বলে সাতকাণ্ড-রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসি। কিন্তু কথাটা বোধ হয় হওয়া উচিত: সীতা রামের বোন—কারণ সুনীতিবাবুর তাই মত।

দীপ-শলাকা যেমন প্রদীপ শিখাকে প্রজ্জলিত করতে সাহায্য করে, সীতাও তেমনি সমগ্র রামায়ণ-কাহিনীকে অন্তরাল হতে ধরে রেখেছে। সীতাকে অবলম্বন করেই সমগ্র রামায়ণের ঘটনা বিন্যাস। সীতাকে আধার করেই রাম-চরিত্রের মধ্যে যত রকমের জটিল ট্রাজেডির আবির্ভাব। সীতার জন্যই রামচরিত্র এত উদার এত মহৎ, এতখানি নিষ্কাম ও প্রজাবৎসল হতে পেরেছে।

শিকড় যেমন মাটির অন্তরালে আত্মগোপন করে, প্রতিনিয়ত রস সংগ্রহ করে বৃক্ষের অস্তিত্বকে রক্ষা করে, তাকে বড় করে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়—সীতাও তেমনি অলক্ষে থেকে সমগ্র রামায়ণরূপী বৃক্ষকে মহীরূহে রূপান্তরিত করেছেন।

রাবণের অশোককাননে সীতা যখন বন্দিনী রাম তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,—তাঁর চরিত্রের বিক্রম প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় তখনই। সীতা যখন লবকুশকে বুকে নিয়ে লোকালয় হতে বহুদূরে বনবাসে নির্বাসিতা, তখনই রামচন্দ্র মহৎ প্রজাবৎসল রূপে আত্মপ্রকাশের পথ পান। সীতার বেদনায় পাঠকের দু-চোখ আকুল হলেই শ্রীরামচন্দ্র হতে পারেন নিষ্কাম, মোহমুক্ত, ত্যাগী, ঋষি, অবতার—তুলনারহীত দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শাশ্বতকালের রাজা, মানবহৃদয়ের মণিকোঠার আদরণীয় নৃপতি—রাজা রাম! মৌনতাই সীতাচরিত্রের সবচেয়ে বড় সংলাপ—সহনশীলতাই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড প্রতিবাদ!

বাল্মীকি তাঁর বেদনা প্রকাশের সঠিক ভাষা হয়তো খুঁজে পান নি, তাই সীতার অনুচ্চারিত বেদনা যুগ হতে যুগান্তরে মানব মনের অন্তর দেহলিতে ডুঁকরে কাঁদে—ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে। বাল্মীকির 'বাণী হারা সেই ছন্দ যেন তাঁর বীণায় নিভৃত মনের আপন বাণীরে খুঁজিয়া পায়।' সীতাকে আলিঙ্গন করেই রামচরিত্রের গতিময়তা, যেমন করে তটের আধারে নদীর গতি সঞ্চার; গিরিকীরিটে সঞ্চিত নিরুত্তাপ তুষার যেমন নিঃশব্দে গলে-গলে ঝর্ণাধারাকে অব্যাহত রাখে, সীতার ভাষাহীন বেদনাধারাও তেমনি রামায়ণের প্রবাহে গতিসঞ্চার করেছে—তাতে বেগ এনেছে; ঢেউ তুলেছে, সে ঢেউয়ের দোলা লেগেছে মানবমনের কূলে কূলে, সভ্যতার ঘাটে-ঘাটে, যুগ হতে যুগান্তরে সে প্রবাহ আজিও অম্লান!

দময়ন্তীকে আধার করে রাজা নলের চরিত্রে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ দেখা যায় না। সাবিত্রী সত্যবানকে আত্মসাৎ করেছেন। তপস্যান্তে সাবিত্রী যখন সত্যবানকে নবজীবনে ফিরিয়ে আনেন তখন নতুন করে তাঁদের জীবন শুরু হয় বটে, কিন্তু সত্যবান সেখানে নিষ্প্রভ—সাবিত্রীরই জয়-জয়কার! সীতা ঠিক তার বিপরীত—তাঁর ত্যাগের মহিমায় রামচরিত্র মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। তাই সীতার সঙ্গে সাবিত্রী ও দময়ন্তীর কোন তুলনাই চলে না—আসলে তুলনা হয় না। যেমন হয় না রামের সঙ্গে অর্জুনের।

সময়ের দিক থেকেও সীতা ত্রেতাযুগের সৃষ্টি। দময়ন্তী ও সাবিত্রী মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত—দ্বাপরের চরিত্র হলেন এঁরা। সীতা মনুশাসিত সমাজের সম্ভ্রমময়ী

নারী। সাবিত্রীচরিত্রে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত। যমের সঙ্গে সাবিত্রীর বাক্যালাপে বুদ্ধিমতী রমণী হিসাবে তার মূল্য যতটা আদরণীয়, সম্ভ্রমময়ী নারী রূপে ততটা নয়। সাবিত্রী যদি হন চঞ্চলা কিশোরী, সীতা সেখানে ভোগবতী রমণী হতে দেবী ভগবতীর স্তরে উন্নীত। সাবিত্রীর লক্ষ্য স্বামীর জীবন, সাংসারিক ভোগবিলাস—সীতার আত্মত্যাগ প্রজার মঙ্গলার্থে।

দময়ন্তী শনির প্রকোপে দিশাহারা বিপন্ন। বিয়োগান্ত পরিণতি আবার মিলনান্ত হয়ে ওঠে রাজা নলের সঙ্গে পুনর্মিলনে। কিন্তু সীতা? তাঁর দুঃখ প্রকাশের ভ ষা স্বয়ং বাল্মীকিরই ছিল না—আমি তো কোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ। সুনীতিবাবু কি করে যে এমন একটা অভিনব (!) সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা তিনিই জানেন।

প্রকৃতপক্ষে-সীতা, সাবিত্রী এবং দময়ন্তী প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বতন্ত্র। আপন আপন মহিমায় এ'রা সমুজ্জ্বল। কারোর সঙ্গেই কারোর তুলনা চলে না। তথাপিও যদি তুলনা করে একের দ্বারা অপরের প্রতি প্রভাব নিতান্ত আবিষ্কার করতেই হয় তা হলে বলতেই হবে সীতাচরিত্রের প্রভাবেই সাবিত্রী ও দময়ন্তী প্রভাবিত। কারণ যুগের হিসাবে সীতা হলেন ত্রেতাযুগের আর সাবিত্রী ও দময়ন্তী হলেন দ্বাপরের। সুতরাং পূর্ববর্তীর প্রভাব পরবর্তীতে সঞ্চারিত হওয়াটাই স্বাভাবিক—পরবর্তীর প্রভাব কখনই পূর্ববর্তীতে সঞ্চারিত হতে পারে না।

যাই হোক, এবার আসা যাক রামায়ণে গ্রীক-প্রভাব সম্পর্কে। প্রয়াত আচার্য রামায়ণে দেশী-প্রভাব লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি এই কাব্যে যথেষ্ট গ্রীক-প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে ইলিয়াড ও অডিসির অনুসরণে রামায়ণ রচিত হয়েছে। রাম-রাবণের যুদ্ধ ট্রয়ের যুদ্ধের অনুকরণে লিখিত সেই সঙ্গে রাবণ-কর্তৃক সীতা-হরণ ইলিয়াডের পারিসের হেলেনী-হরণের প্রভাবে পরবর্তীকালে সংযোজিত।

সুনীতিবাবুর গ্রীক-প্রীতি একটু অধিক মাত্রায় ছিল, একথা অনেকেরই জানা আছে। ভারতীয় যে কোন সাংস্কৃতিক বিষয়ে তিনি খানিকটা গ্রীক অনুপ্রবেশ আবিষ্কার করে ভারি তৃপ্তিবোধ করতেন, তা তিনি করুণ। তাতে সত্য-বিকৃতির সম্ভাবনা নেই। মনে হয়, Weber-এর মতকেই সমর্থন জানাতে সুনীতিবাবু রামায়ণে গ্রীক-প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। Weber-এর মতে, গ্রীস দেশের কবি হোমরের হেলেন ও ট্রয়ের যুদ্ধ-কাহিনীর অনুসরণে রামায়ণ রচিত।

হোমরের আবির্ভাব কালসম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবে বিভিন্ন

বিশেষজ্ঞের মতানুসারে খ্রীষ্টপূর্ব দশম একাদশ-শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব। অন্যদলের মতে, হোমর খ্রী.পূর্ব অষ্টম শতাব্দীর কবি। তবে সমগ্র পণ্ডিত সমাজই এ-বিষয়ে একমত যে, গ্রীকবীর আলেকজান্দারের বহুপূর্বেই তাঁর কাব্য পূর্ণ এবং পরিণতরূপ লাভ করেছিল।

কিম্বদন্তী-অনুসারে হোমর ছিলেন পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান। তাঁর মা ক্রিথীইস গোপন মিলনে এই পুত্রের জন্ম দিয়ে তাঁর অভিভাবকদের আশ্রয় ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।...ভাবীকালের বিশ্ববিখ্যাত পুত্রের জন্ম দিয়ে মাতা ক্রিথীইস ফীমেউস নামে এক বিদ্যালয়-শিক্ষককে বিবাহ করেন। এই উদারচেতা মহান শিক্ষক হোমরকে দত্তকপুত্র রূপে মানুষ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হোমরের জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে ব্যাসদেবের জীবন বৃত্তান্তের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সুনীতিবাবুর সমর্থকগণ এক্ষেত্রে কি বলবেন কে:কার দ্বারা প্রভাবিত?

হোমর যদি খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর কবিও হন, তথাপিও তিনি বৈদিক-যুগের বহুপরবর্তী কালের কবি এবং রামায়ণের কালেরও অন্তত তিন হাজার বছর পরে তাঁর জন্ম। অন্যদিক থেকেও তা প্রমাণিত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে থেলিস সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন পৃথিবী জলের উপর ভাসমান, জলই সৃষ্টির আদি। পাশ্চাত্যদেশে এ আবিষ্কার অভিনব হলেও তার বহু-বহু বছর পূর্বে ভারতবর্ষ পঞ্চতন্মাত্র তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সে অতি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। যা সম্যকভাবে অবগত হতে হলে সূর্যবিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার। অদ্যাবধি ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশই সূর্যবিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত নন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কেউই তা জানেন না। গ্রীক দার্শনিকগণ যখন আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে দোদুল্যমান ভারতবর্ষ তখন জন্মান্তরবাদের পর্ব শেষ করে ফেলেছে: ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ এবং সত্যলোকে তার অবাধ যাতায়াত। সুতরাং কোনভাবেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গ্রীক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত নয় বরং নির্দ্বিধায় বলা যায়, ভারতবর্ষ থেকেই বীজবহন করে নিয়ে গিয়ে গ্রীক সভ্যতা ও দর্শনের বিকাশ ঘটে।

'প্লেটোর রচনাবলীর মধ্যে এমন অনেক কথাই আছে যাহা ভারতীয় মনকে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। কথিত আছে কিছু সংখ্যক ভারতীয় ব্রাহ্মণ-ঋষি গ্রীস পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তবে কি প্লেটো এই সব তত্ত্বকথার জন্য ভারতের কাছে ঋণী? অথবা তিনি কি পিথাগোরাসের কাছে এই সব পাইয়াছিলেন?

পিথাগোরাস জন্মান্তরবাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেন, আর এই তত্ত্বটির মাধ্যমে আমরা পাই গ্রীসের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্রের একটি ইঙ্গিত।

Dr. wriwck তাঁর 'মেসেজ অফ প্লেটো' নামক পুস্তকে বেশ প্রশংসনীয় আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, 'রিপাবলিকের অনেক শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের জন্য প্লেটো ভারতের কাছে ঋণী।' [প্রাচ্য পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহান যীশুও ভারতবর্ষে এসেছিলেন, একথা এখন আর অবিদিত নয়। সুতরাং যে কোন দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, আদিকালের রহস্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন এবং দর্শনের নবদিগন্ত উন্মোচনের দিশারী এই ভারতবর্ষ। দর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলেও তাই পাওয়া যায়।

ধ্বনিতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিজ্ঞান সম্পর্কে বৈদিক ঋষিদের বহুপূর্বে তন্ত্রধর্মের প্রবক্তা শিব যে ব্যাখ্যা করে গেছেন তা আজও আধুনিক বিজ্ঞানের আয়ত্ত্বের বাইরে। যেমন হ্রীং বা ক্রীং যে-কোন একটি বীজকে ভাঙলে পাওয়া যায় (হ+ঋ+ঈ +ং। এই চারটি ধ্বনি থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তা হল হ=ইচ্ছাশক্তি, ঋ= কর্মশক্তি বা তেজশক্তি, ই বা ঈ=বিজ্ঞানশক্তি, ং=জ্ঞানশক্তি ধ্বনিকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানময় কোষ পর্যন্ত সৃষ্টির বিবর্তন-রহস্যের যে হাতেকলমে ব্যাখ্যা ও তার প্রমাণ পৃথিবীতে এ-জিনিস আর কোথাও নেই। সুতরাং কেউ যদি জোর করে ভারতীয়তার উপর বিদেশীসভ্যতার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে পাণ্ডিত্যের বড়াই করতে চান তো করুন তাতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মান যাবে না।

এতক্ষণ ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের কিঞ্চিৎমাত্র তুলনামূলক আলোচনা করা হল। তাতে অন্তত একটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রামায়ণের যুগে ভারতীয় সাহিত্যে গ্রীক প্রভাব অতিকল্পনা মাত্র। ইলিয়াডের সঙ্গে রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা হয়ই না। রামচন্দ্রের বিশাল ব্যাপকতার পাশে ইলিয়াডের হেক্তোরের স্থান অতি ক্ষুদ্র।

সুনীতিবাবু বলেছেন, হেলেনী-হরণের অনুকরণে রাবণ-কর্তৃক সীতা-হরণ। প্রয়াত আচার্য হয়তো লক্ষ্য করেন নি, রাবণ মহাজ্ঞানী তাপস। রামের হাতে নিহত হওয়ার জন্যেই তার সীতা-হরণ। অযোধ্যাকাণ্ডে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময়েই তার আভাষ মিলেছে। রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ একটা উপলক্ষ্যমাত্র, লক্ষ্য রামের হাতে নিহত হয়ে তাঁর মুক্তিলাভ। কিন্তু ইলিয়াডে পারিসের হেলেনী-হরণ শুধু প্রাকৃত সম্ভোগ-চরিতার্থের নিমিত্তেই। হেলেনী যে

পারিসকে ভালবেসে স্ব-ইচ্ছায় ত্রয়ী রাজ্যে গমন করেছিলেন তার ইঙ্গিত আছে ইলিয়াডের তৃতীয় স্বর্গে। সীতা রাবণের মুখ পর্যন্ত দর্শন করেন নি এমন কি রাবণের শত সহস্র প্রলোভনেও! শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানেই তিনি ছিলেন তপমগ্না। সীতার সহনশীলতার সঙ্গে হেলেনীর কোন তুলনাই চলতে পারে না। সীতার পরিপূর্ণতা তাঁর মাতৃত্বে—তিনি মমতাময়ী, স্নেহময়ী, সাধ্বীরমণী, ধরিত্রীর মতো সহনশীলা—হেলেনীর চরিত্রে তার আভাস কৈ!

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে হেক্তোরের আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও ব্যবধানও বিস্তর। শ্রীরামচন্দ্র একদিকে বস্তুবাদী অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চেতনায় সমুন্নত। তাঁর দূরদৃষ্টি প্রজানুরঞ্জনের সঙ্গে হেক্তোরের তুলনাই চলে না। হেক্তোর শুধুই বস্তুবাদী। রামানুজ লক্ষ্মণের সঙ্গে বন্ধু-প্রতিম আখিল্লেউস-সহচর পাত্রক্লসের সাদৃশ্য আবিষ্কারে কেউ-কেউ বিশেষ আগ্রহী, লক্ষ্মণ-চরিত্রের কঠোর সংযমের কনামাত্রও সেখানে অনুপস্থিত।

তফাৎ আছে হোমর ও বাল্মীকির জীবনদর্শনের মধ্যেও। যদিও একথা অনস্বীকার্য উভয়েই মহাকবি। তথাপি বাল্মীকি শুধু কবিই নন, তিনি মহর্ষিও বটেন। হোমর শুধু জীবনের কবি—জীবনের কথা কাব্যে বলেন, বাল্মীকির যাত্রাপথ মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে সুদূর নক্ষত্রলোকে বিস্তৃত।

বাল্মীকির রাম-সীতা ও লক্ষ্মণ দুঃখের কঠিন তপস্যায় উত্তীর্ণ সিদ্ধ তাপস; জীবন শেষ করে জীবন শুরু করেন। হোমরের হেক্তোর, হেলেনী, আখিল্লেউস নেস্তোর ত্যাগী কিন্তু যোগী নন। কষ্টসহিষ্ণু হলেও আত্মপ্রশংসা মুখর। এঁরা দুঃখে পরাঙ্মুখ না হলেও দুঃখকে জয় করতে পারেন নি। হোমরের আদর্শ প্রবৃত্তিমার্গ, বাল্মীকির পথচলা নিবৃত্তি মার্গের দিকে। 'হোমরের আদর্শ পাশ্চাত্য জাতিকে দেশ-প্রেমিকতায় দীক্ষিত ও কর্মচঞ্চল করেছে, বাল্মীকির আদর্শ ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন করেছে। (ইলিয়াড, পৃ. ৯) অতএব একথা কিছুতেই স্বীকার্য হতে পারে না যে, ইলিয়াডের আদর্শে রামায়ণ রচিত হয়েছে।

সুনীতিবাবুর আরও বক্তব্য খ্রীষ্টিয় ৭ম শতকে রাম বিষ্ণুর অবতার রূপে পূজিত হন। আগেই প্রমাণিত খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে রাম নারায়ণরূপে পূজিত হচ্ছেন। তিনি বলেন খ্রীষ্টিয় ২য় শতকে রামায়ণ বর্তমান-রূপ পরিগ্রহ করে। এ প্রশ্নেরও উত্তর পূর্বে দিয়েছি। শেষ কথা, বাল্মীকি চারণকবি ছিলেন।

সুনীতিবাবু এখানে কোন বাল্মীকির কথা বলেছেন? বাল্মীকি যে একজন নন, সেকথা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। রামায়ণ-রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকিকেই তিনি চারণ আখ্যা দিতে চেয়েছেন কিনা তা পরিষ্কার বলেন নি। তবে আমরা যে রামায়ণকার বাল্মীকিকে জানি তিনি ফলাহারী তপোবনবাসী ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছিলেন। তাঁর চারণ বৃত্তির কোন প্রমাণ আমরা পাই নি। রাম সমীপে লবকুশের রামায়ণগান তো উদ্দেশ্য সাধনে সংঘটিত।

গ্রন্থপঞ্জী

এই রচনায় অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সহায়তা নিয়েছি :

১. গৌড়-কাহিনী : আদিযুগ—শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ (ভারতজ্যোতি প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ ১৮৮৬ শকাব্দ)

২. গৌড়-কাহিনী : মধ্যযুগ—শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ (ভারতজ্যোতি প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ ১৮৮১ শকাব্দ)

৩. সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. ভক্তিযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত (কেদারনাথ বসু-প্রকাশিত দ্বাদশ সংস্করণ, ১৩২৫ সাল)

৫. হিন্দু-সর্বস্ব—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত (বসুমতী, অষ্টম সংস্করণ ১৩১২ সাল)

৬. ভারত ও সোভিয়েট মধ্য-এশিয়া—বিনয় ঘোষ (ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, প্রথম সংস্করণ ১৯৪৭)

৭. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ (পুস্তক প্রকাশক, ১ম সংস্করণ ১৯৫৭)

৮. ইলিয়াড—মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য (প্রাচী-প্রতীচী, ১ম সংস্করণ ১৩৮৩)

৯. বাঙালী বুদ্ধিজীবি মানস ও সমাজ ভাবনা—মিহির আচার্য (লেখক-সমাবেশ, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭)

১০. কোরআণ শরীফ (হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৪)

১১. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার : ১ম খণ্ড —জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (ডি-এম লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ ১৩৭১)

১২. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার : ২য় খণ্ড —জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (ডি-এম, ১ম সংস্করণ ১৩৭১)

১৩. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (এম. সি. সরকার, ১ম সংস্করণ ১৩৭২)

১৪. ক্রমবিকাশের পথে—সত্যানন্দ (প্রকাশক স্বামী আত্মানন্দজী, বেনারস ১৩৪৩)

১৫. বাল্মীকি-রামায়ণ—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-অনূদিত(ভারবি সংস্করণ ১৯৮৫)

১৬। বাল্মীকি-রামায়ণ—পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত (বঙ্গবাসী, ৪র্থ সংস্করণ ১৩১৫)

১৭. ঋকবেদ : ১ম খণ্ড—রমেশচন্দ্র দত্ত-অনূদিত (হরফ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ ১৯৭৬)

১৮. কালিদাস-রচনাবলী : ১ম ভাগ—পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত (বসুমতী, ১০ম সংস্করণ ১৩৫৬)।

১৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী : ১৩শ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

২০. মনুসংহিতা—পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত (সংস্কৃত-পুস্তক-ভাণ্ডার ১৩৯৭)

২১. বিশ্বকোষ : প্রথম খণ্ড—নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত।

২২. কথাসরিৎসাগর : ১ম খণ্ড (ভারবি সংস্করণ, ১৯৭৭)

২৩. বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় (দে'জ সংস্করণ, ১৯৮৭)

২৪. বাঙলাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ—রমেশচন্দ্র মজুমদার (জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৭)

২৫. বাংলা পীরসাহিত্যের কথা—ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস।

২৬. কালান্তার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী—আবদুল গফুর সিদ্দিকি।

২৭. ভারতে ইসলাম : একটি সমীক্ষা (বিশ্বহিন্দু পরিষদ প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ ১৩৯০)

২৮. অযোধ্যায় শ্রীরাম আর কতদিন অপমান সইবেন ?—গুমনমললোধা : বাংলা ভাষান্তর (১৯৯০)।

২৯. রামজন্মভূমি মন্দির না বাবরি-মসজিদ (প্রচারবিভাগ : বিশ্বহিন্দু পরিষদ)

৩০. বঙ্গদর্শন (মাঘ সংখ্যা ১২৭৯)

৩১. A clash of cultures : Avadh, the British and Mughals : (Monohar Publication, new Delhi)

৩২. Encyclopaedia Britanica (Chicago Edition 15th) 2nd Vol)

৩৩. Encyclopaedia Britanica, London, 135 Vol.

৩৪. A Historical And Legal Perspective—Justice Deoki Nandan (1990)

৩৫. Ram-Janmabhoomi VS. Babrimasjid by Koenraad Elst (Voice of India, New Delhi (1990)

৩৬. Babri-Masjid Ram-Janmabhoomi Controversy—Editor Asghar Ali Engineer, (Ajanta Publication, 1990)

৩৭. History of India : Hindu period—L.K. Mukherjee.

৩৮. T. Walter's : Yuan Chowangs travels in India (London, 1904)

৩৯. Tarikha-I-Firozshani : Ziauddin Baruni (Cal, 1860).

৪০. The Baburnamah : Vol II —Beveridge A. S. (1922.)

৪১. আকবরনামা—অনুবাদ শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০৬)

৪২. অপরাধ ও অনাচার—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সাহিত্যপ্রকাশ, ১ম সংস্করণ ১৩৯১)